NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

SUBSIDIARY ZOOLOGY

SZO - 02

BLOCK : 2

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর, প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক— অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ ঃ অক্টোবর, 2015

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau
of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ সহায়ক প্রাণীবিদ্যা **স্নাতক পাঠক্রম**

পাঠক্রম ঃ SZO—2
পর্যায় ঃ 02
একক ঃ 1, 2 এবং 3

	রচনা	সম্পাদনা
একক - 1	শ্রীমতী শান্তা আদক	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক - 2	শ্রীমতী মৌসুমী দাস	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক - 3	শ্রীমতী পাপিয়া দাস	ড. বুদ্ধদেব মান্না

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

SZO – 02
Block - 2

একক 2 ঃ কোষ-জীন বিজ্ঞান ও অনুকোষ বিজ্ঞান

(এই এককটিতে আপনারা কোষ-জীন বিজ্ঞান ও অনুকোষ বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত সাবইউনিটগুলি অধ্যয়ন করবেন)

পর্যায়

2

একক 2.1	❑ প্লাজমা পর্দা	7-15
একক 2.2	❑ মাইটোকনড্রিয়ার গঠন এবং কার্য্য	16-26
একক 2.3	❑ ক্রোমোজোমের গঠন	27-37
একক 2.4	❑ DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠন	38-53
একক 2.5	❑ ড্রসোফিলা ও মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ	54-63
একক 2.6	❑ থ্যালাসেমিয়া	64-67
একক 2.7	❑ পরিব্যক্তি বা মিউটেশন	68-76

একক 2.1 ❑ প্লাজমা পর্দা (Plasma membrane)

গঠন

2.1.1 প্রস্তাবনা

2.1.2 প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন

2.1.3 প্লাজমা মেমব্রেনের কাজ

2.1.4 মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে চলাচল বা পরিবহণ

2.1.5 সারাংশ

2.1.6 প্রশ্নাবলী

2.1.1 প্রস্তাবনা

কোষপর্দা বা প্লাজমাপর্দা কোষের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। সকল উন্নত উদ্ভিদ এবং প্রাণীকোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে এই সজীব, সক্রিয়, স্থিতিস্থাপক পর্দাটি উপরিত থাকে। 1831 খ্রিস্টাব্দে প্লয়ে (Plawe) নামক এক কোষ বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম প্লাজমালেমা শব্দটি ব্যবহার করেন। 1855 খ্রিস্টাব্দে ন্যাগেলি ও ক্র্যামার (Negeli and Cramar) এই কোষপর্দার নামকরণ করেন প্লাজমালেমা বা প্লাজমাপর্দা। প্রাণীকোষে প্লাজমাপর্দা কখনও কখনও আঙ্গুলের মত উপবৃদ্ধির সৃষ্টি করে, এদের মাইক্রোভিলি (microvilli) বলে। যকৃৎ কোষ, জরায়ুকোষ, খাদ্যনালীর গাত্রকোষ, পিত্তাশয়ের আবরণী কোষ ইত্যাদিতে মাইক্রোভিলি থাকে।

2.1.2 প্লাজমা পর্দার গঠন

সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমাপর্দাকে প্রোটোপ্লাজম থেকে আলাদা করা যায় না। সম্প্রতি ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্লাজমাপর্দার আলট্রা গঠন (ultra structure) সম্পর্কে নানা তথ্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। 1895 খ্রিস্টাব্দে ওভারটন (Overton, 1895) সর্বপ্রথম প্লাজমাপর্দার গঠন দেখেন এবং লাইপয়ডাল মতবাদ (Lipoidal theory) প্রবর্তন করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী প্লাজমা পর্দায় একটানা লিপিড স্তর থাকে। 1933 খ্রিস্টাব্দে কোল্লান্ডার ও বারলান্ড (Collander and Barlund) বলেন যে, প্লাজমাপর্দা লিপিড দিয়ে তৈরী তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু এর মধ্যে অসংখ্য ছিদ্রও থাকে। গোর্টনার ও গ্রেন্ডেল (Gortner and Grendell, 1925) এর মতে প্লাজমাপর্দা লিপিড দ্বিস্তর পাত দিয়ে তৈরী। কোল (Cole, 1932) এবং হার্ভে ও সার্পিরো (Harvey and Sharpiro)-র মতে প্লাজমা পর্দায় লিপিড ছাড়াও অন্য কোন বস্তু থাকে। ড্যানিয়েলি ও হার্ভের (Danielli and Harvey) মতে প্লাজমা পর্দার লিপিড ছাড়াও যে বস্তুটি থাকে, সেটি হল প্রোটিন। 1952 খ্রিস্টাব্দে ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসন (Danielli and Davson) প্লাজমাপর্দার গঠনে ত্রি-স্তর বিশিষ্ট কাঠামোর কথা বলেন। ড্যানিয়েলি ও হার্ভের মতে প্লাজমাপর্দার দুই অণু লিপিডের দুইদিকে দুটি স্তরে প্রোটিন অণু থাকে। ইলেকট্রন

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মোটামুটিভাবে প্লাজমাপর্দার এই প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন গঠন প্রমাণিত হয়। 1959 খ্রিস্টাব্দে রবার্টসন (Robertson) প্লাজমাপর্দার এইরূপ গঠন বহুস্থানে দেখেন এবং "একক ঝিল্লি" বা পর্দা (Unit membrane) মতবাদ প্রচার করেন। এই এক ঝিল্লির গঠন সর্বদাই 'প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন' এই ত্রিস্তর বিশিষ্ট হয়। দুটি ঘন প্রোটিন স্তরের মাঝে একটি লিপিড স্তর থাকে। এই একক ঝিল্লি গঠন যে শুধুমাত্র প্লাজমা পর্দায় দেখা যায় তাই নয়; কোষের সকল অঙ্গাণুতেও, যেমন এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, গলগি বস্তু, লাইসোজোম, প্লাসটিড ইত্যাদিতে একক ঝিল্লি গঠন দেখা যায়। মাইটোকনড্রিয়ার বাহিরের এবং ভেতরের পর্দা এবং নিউক্লিয়াসের ঝিল্লি গঠনেও এই একক ঝিল্লি গঠন দেখা যায়। অধিকাংশ কোষের প্লাজমাপর্দাই 100 – 215 Å পুরু হয়।

কোষপর্দার বেশীর ভাগ গবেষণাই স্তন্যপায়ী প্রাণীর লোহিত রক্ত কণিকা (RBC), স্নায়ুতন্তুর মায়েলিন আচ্ছাদন এবং অক্ষিপটের রড ও কোণ (rod and cone) কোষের উপর সীমাবদ্ধ। কোষপর্দার মধ্য দিয়ে অতি সহজে লিপিড দ্রাবক প্রবেশ করতে পারে। অপরপক্ষে জলের মত পোলার অণু বাধাপ্রাপ্ত হয়।

2.1.2.1 ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতবাদ

এই মত অনুসারে প্লাজমাপর্দা তিনটি স্তর নিয়ে গঠিত (চিত্র 1.1)। দুইদিকে দুটি ঘন প্রোটিন স্তর এবং মাঝে হালকা লিপিড স্তরটি 'স্যাণ্ডুইচ' অবস্থায় থাকে। তিনটি স্তরের মোট বেধ প্রায় 100Å।

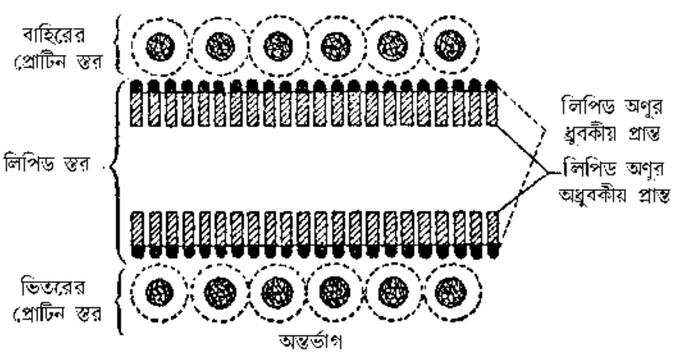

চিত্র 1.1 ঃ ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতে কোষঝিল্লির প্রতিরূপ

2.1.2.2 রবার্টসনের একক ঝিল্লি মতবাদ

এই মতবাদের প্রবক্তা জে. ডি. রবার্টসন (J. D. Robertson, 1959)। সেই কারণে এই প্রতিরূপটিকে রবার্টসনের মডেল বলা হয়। এই মডেল অনুযায়ী, কোষঝিল্লির দুই দিকে দুটি ঘনস্তর এবং এদের মাঝখানে একটি হালকা স্তর থাকে। প্রত্যেকটি ঘন স্তর 20Å পুরু এবং মাঝের হালকা স্তরটি 35Å পুরু; এইরূপে একটি একক বেধ (Unit thickness) তৈরী হয়, যা 75Å (20 + 35 + 20 = 75Å) পুরু। রবার্টসনের মতে, বিভিন্ন প্রকার কোষে যত প্রকার ঝিল্লি আছে তাদের সকলেরই মৌলিক গঠন এই ত্রিস্তরবিশিষ্ট একক ঝিল্লি (চিত্র 1.2)। মাঝের হালকা স্তরটিতে লিপিড অণুগুলি এক অণুবিশিষ্ট দুটি সারিতে সজ্জিত থাকে। লিপিড অণুর জলাসক্ত ধ্রুবক প্রান্তগুলি (hydrophilic polar ends) প্রোটিনের সঙ্গে সংযোজিত এবং জলবিদ্বেষী অধ্রুবকীয় প্রান্তগুলি (hydrophobic nonpolar ends) পরস্পর সংলগ্ন থাকে। লিপিড স্তর দুটি আন্তরানবিক আকর্ষণ বল (van-der-

waals force)-এর সাহায্যে পরস্পর অধ্রুবকীয় প্রান্তে যুক্ত থাকে এবং এদের ধ্রুবকীয় প্রান্তগুলি প্রোটিন স্তরের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনী (hydrogen bond) বা আয়ন যোজ্যতার (ionic linkage) দ্বারা সংযোজিত থাকে। ফলে, অণুগুলি স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারে না। এই মতানুসারে লিপিড স্তরই ঝিল্লি কাঠামোর প্রধান অংশ।

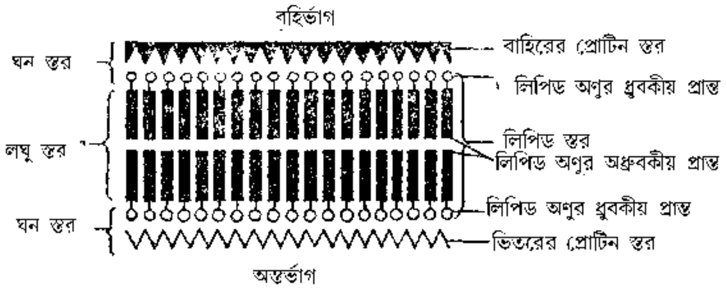

একক মেমব্রেন মডেল

চিত্র 1.2 ঃ রবার্টসনের 'একক ঝিল্লি' প্রতিরূপ

প্লাজমাপর্দার বাইরের দিকের প্রোটিন স্তরটি ভিতরের দিকের প্রোটিন স্তর অপেক্ষা একটু ভিন্ন ধরনের হয়। বাইরের প্রোটিন স্তরে কিছু পরিমাণ পলিস্যাকারাইড থাকে, কিন্তু ভিতরের স্তরে থাকে না। ঘন স্তরে প্রোটিন অণুগুলি সম্পূর্ণ বিস্তৃত অবস্থায় থাকে। গোলাকার প্রোটিন অণু সাধারণত থাকে না। তবে অনেক সময় গোলাকার প্রোটিন অণু মৌলিক গঠনের সঙ্গে গৌণভাবে সংযোজিত হতে পারে।

ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মডেলের সঙ্গে একক ঝিল্লি মতবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(1) পূর্বতন মতবাদে কটি অণু লিপিড স্তর থাকে তা বলা হয় নি, কিন্তু একক ঝিল্লি মতবাদ অনুসারে দুটি অণু লিপিড স্তর থাকে।

(2) পূর্বতন মতানুসারে একটানা সমান ঝিল্লির কথা বলা হয়েছে কিন্তু একক ঝিল্লি মতবাদ অনুসারে এটি অসম দুটি প্রোটিন স্তর নিয়ে গঠিত।

(3) পূর্বতন মতবাদে প্রোটিন স্তরে শুধুমাত্র গ্লোবিউলার প্রোটিন থাকে, কিন্তু একক ঝিল্লি মতবাদ অনুসারে প্রোটিন স্তরটিতে, সম্পূর্ণ বিস্তৃত ফাইব্রাস প্রোটিন থাকে।

2.1.2.3 ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল (The fluid mosaic model)

1972 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী সিঙ্গার এবং নিকলসন (Singer and Nicolson) প্রথম, কোষপর্দার ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল সম্পর্কে তাঁদের মতবাদ প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে ফসফোলিপিডের দুটি স্তরের মধ্যে প্রোটিন অণুগুলি ভেসে থাকে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রোটিন অণুগুলি একটি মোজেইক গঠন করে। ফসফোলিপিডের স্তর দুটি হল ফ্লুয়িড বা তরল। এর ফলেই প্রোটিন অণুগুলি একটি ফ্লুয়িড মোজেইক রূপ গঠন করে।

এই মতানুসারে প্লাজমা পর্দার গঠন নিম্নরূপ ঃ

- প্লাজমাপর্দাটি 7 mm চওড়া হয়।
- মূল গঠনটি হল ফসফোলিপিডের দুটি স্তর।
- ফসফোলিপিডের জলাসক্ত ফসফেট প্রান্তগুলি বাইরের দিকে সজ্জিত থাকে।
- জলবিদ্বেষী হাইড্রোকার্বনের প্রান্তগুলি ভেতরের দিকে পরস্পর সংলগ্ন থাকে।

- ফসফোলিপিড হল তরল এবং তারা নিজেদের স্তরের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়।
- বেশিরভাগ প্রোটিন অণুগুলিই দ্বিস্তর ফসফোলিপিডের মধ্যে ভেসে থাকে এবং ফ্লুয়িড মোজেইক রূপ গঠন করে।
- প্রোটিনগুলি পর্দার মধ্যেই থাকে, কারণ তাদের জলবিদ্বেষী অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি ফসফোলিপিডের জলবিদ্বেষী অধ্রুবকীয় প্রান্তগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বাকী প্রোটিনগুলি হল জলাসক্ত এবং তারা হয় কোষের দিকে মুখ করে থাকে অথবা বাইরের পরিবেশের দিকে মুখ করে থাকে।
- কিছু প্রোটিন, আংশিকভাবে এবং কিছু প্রোটিন পুরোপুরি ভাবে প্লাজমাপর্দা ভেদ করে অবস্থান করে।
- কিছু প্রোটিন এবং লিপিডের কার্বহাইড্রেটের চেইন শাখাপ্রশাখার মত বিস্তৃত থাকে। এগুলি গ্লাইকোপ্রোটিন এবং গ্লাইকোলিপিড তৈরী করে।
- পর্দায় কোলেস্টেরলও উপস্থিত থাকে এবং এর উপস্থিতি পর্দাটিকে আরও মজবুত বা সুস্থিত করে তোলে। কোলোস্টেরলের অণুপস্থিতিতে প্লাজমা পর্দা ভেঙ্গে যায়।
- প্লাজমাপর্দার দুটি স্তরের অংশ, গঠনে এবং কার্যে ভিন্ন হয়।
- যে প্রোটিনগুলি পুরোপুরিভাবে প্লাজমাপর্দা ভেদ করে অবস্থান করে, তাদের ইন্টিগ্রাল (integral) প্রোটিন বলে। কিছু প্রোটিন ইন্টিগ্রাল প্রোটিনের সঙ্গে বাইরের দিকে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অথবা হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত থাকে, এদের পেরিফেরাল (peripheral) প্রোটিন বলা হয়। আবার কিছু প্রোটিন আছে যেগুলো প্লাজমা পর্দার লিপিডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এদের বলে লিপিড যুক্ত প্রোটিন।

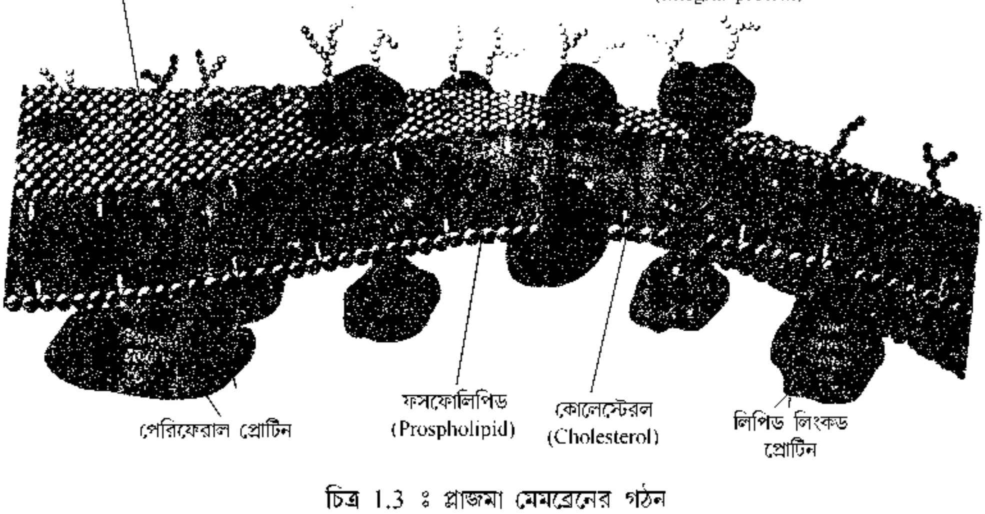

চিত্র 1.3 ঃ প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন

পরবর্তীকালে ফ্রীজ ফ্র্যাকচ্যার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি (Freez fracture electron microscopy), এই পদ্ধতির দ্বারাও উপরোক্ত প্লাজমা পর্দার গঠনের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এই পদ্ধতিতে, প্রথমে প্লাজমাপর্দাটিকে তরল নাইট্রোজেনে $-196^{0}C$-এ ঠাণ্ডায় জমানো হয় এবং এটিকে এমনভাবে ভাগ করা হয় যাতে ফসফোলিপিডের দুটি স্তর পরস্পর পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে যায়। ইন্টিগ্রাল এবং পেরিফেরাল প্রোটিনের অবস্থানও এই পদ্ধতির দ্বারা পুরোপুরি বোধগম্য হয় এবং এটাই ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের সত্যতা প্রমাণিত করে।

ফসফোলিপিড দ্বিস্তরের মধ্যে প্রোটিনের চলাচল বিজ্ঞানী এডিডিন (Edidin) তাঁর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত করেন। তিনি প্রথমে ইঁদুর এবং মানুষের কোষ কালচার করেন। পরে ঐ কালচার থেকে ইঁদুর ও মানুষের কোষ নিয়ে কোষপর্দার প্রোটিনকে তিনি যথাক্রমে সবুজ এবং লাল ফ্লুরোসেন্ট মার্কার (fluorescent marker) দ্বারা চিহ্নিত করেন। সেন্ডাই ভাইরাস (Sendai virus) দ্বারা তিনি পরে ঐ দুই প্রকার কোষকে সংযুক্ত করেন এবং একটি শংকর (hybrid) কোষ তৈরী করেন। এই ধরনের কোষকে **হেটারোক্যারিওন** (heterokaryon) বলা হয় (চিত্র 1.3)। সংযুক্তির ঠিক পরেই ইঁদুর এবং মানুষের প্রোটিনগুলি পৃথক পৃথক থাকে। কিন্তু 40 মিনিট পরে 37^{0}C-এ লাল এবং সবুজ মার্কারগুলি পুরোপুরিভাবে মিশে যায়। এর থেকেই বোঝা যায় প্রোটিন অণুগুলি ফসফোলিপিড দ্বিস্তরে সর্বদা চলাচল করে।

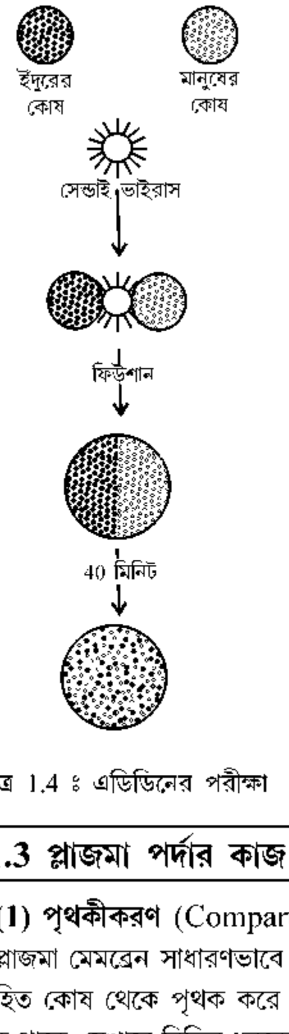

চিত্র 1.4 ঃ এডিডিনের পরীক্ষা

প্রোটিন অণুগুলি যে হারে ফসফোলিপিড পর্দায় চলাচল করে সেটি ফ্লুরোসেন্স ফটোব্লিচিং রিকভারি পদ্ধতির দ্বারা নির্ধারণ করা সম্ভব। একটি কৃত্রিম মেমব্রেন তৈরী করে তাতে একটি ফ্লুরোফোর (fluorophore) যুক্ত করে দেওয়া হয়। ফ্লুরোফোর ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলটিকে রঙীন করে দেয়। পরে লেসার পালস (laser pulse) দিয়ে একটি ছোট নির্দিষ্ট স্থানের ফ্লুরোফোরগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়। যে হারে ঐ বর্ণহীন স্থানটি পুনরায় রঙীন হয়ে যায়, সেটাই প্রমাণ করে যে মেমব্রেনের মধ্যে প্রোটিনগুলি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট হারে চলাচল করে। ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে আমরা সেটা দেখতে পাই। এই পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে 30% থেকে 90% প্রোটিন স্বাধীনভাবে প্লাজমাপর্দার মধ্যে চলাচল করতে পারে।

2.1.3 প্লাজমা পর্দার কাজ (Function of plasma membrane)

(1) পৃথকীকরণ (Compartmentalization) ঃ

প্লাজমা মেমব্রেন সাধারণভাবে কোষমধ্যস্থ বস্তুসমূহ রক্ষা করে। এটি কোষের অভ্যন্তরর কোষ-অঙ্গাণুগুলিকে সন্নিহিত কোষ থেকে পৃথক করে রাখে। বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুগুলিও নিজস্ব মেমব্রেনের দ্বারা অন্য অঙ্গাণু থেকে পৃথক থাকে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যসমূহ ঘটে থাকে। যেমন কোষের মধ্যে অক্সিডেশন, ডিহাইড্রেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন এবং ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন ইত্যাদি মাইটোকনড্রিয়ায় ঘটে থাকে। আবার প্রোটিন সংশ্লেষে রাইবোজোম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি এই সকল অঙ্গাণুগুলি নিজস্ব মেমব্রেনের দ্বারা পরস্পরের থেকে পৃথক না থাকত তাহলে উপরোক্ত বিভিন্ন কার্যের উৎসেচক এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বস্তু একসঙ্গে মিশে যেত এবং কোন কার্যই ঠিকমত সম্পন্ন হোত না।

(2) প্লাজমা মেমব্রেন — নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক (Selectively permeable barrier) ঃ

প্লাজমা মেমব্রেন বিভিন্ন দ্রব্যের কোষের মধ্যে আসা অথবা কোষ থেকে বাইরে যাওয়াকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাধীনভাবে যে কোন বস্তু কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে অথবা কোষ থেকে বাইরে যেতে পারে না। নির্দিষ্ট

কিছু বস্তুকেই প্লাজমা মেমব্রেন বাইরের পরিবেশ থেকে সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে দেয়। এইভাবে প্লাজমা পর্দা নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক (selectively permeable barrier) হিসেবে কাজ করে।

(3) প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর চলাচল ঃ

বিভিন্ন প্রকার ভৌত-রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্য কোষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলাচল করে। পর্দার দু-পাশের ঘনত্বের বৈষমাত্রার উপরেও এটি নির্ভর করে। মেমব্রেনের দু-পাশে দ্রাবের আণবিক ঘনত্ব যদি ভিন্ন হয়, তাহলে অণুগুলি উচ্চ ঘনত্বের দিক থেকে নিম্ন ঘনত্বের দিকে বেশী পরিমাণে বাহিত হয়।

(4) বাইরের সংকেতে সাড়া দেওয়া (Responding to external signals) ঃ

বাইরের কোন উদ্দীপনায় (stimulus) সাড়া দেওয়া কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং সেটি প্লাজমা মেমব্রেনের দ্বারাই সম্ভবপর হয়। প্লাজমা পর্দায় কিছু রিসেপটর থাকে যেগুলি বিভিন্ন লাইগ্যান্ড (ligand) অণুর সঙ্গে যুক্ত হয় (যেটি উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে) এবং এর ফলে বাইরের পরিবেশের সিগন্যাল বা বিশেষ কোনও সংকেত কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। পরে ঐ সংকেত অন্য কোনও নতুন সংকেত বা সিগন্যাল সৃষ্টি করে। এই পুরো ঘটনাটিকে সংকেত পরিবহণ বা সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন (Signal transduction) বলা হয়।

(5) বিভিন্ন কোষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা (Intercellular interaction) ঃ

বহুকোষী প্রাণীতে প্লাজমাপর্দা একটি কোষের সঙ্গে অন্য কোষের সংযোগ রক্ষা করে। পর্দার সাহায্যেই কোষগুলি একে অপরের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং প্রয়োজনমত বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময় করে।

(6) শক্তির পরিবহণ (Energy transduction) ঃ

প্লাজমাপর্দার সাহায্যেই শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। একেই শক্তির পরিবহণ বলে। এটি সব থেকে ভালভাবে বোঝা যায় সালোকসংশ্লেষের সময়। কারণ সালোকসংশ্লেষেই সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয়। পর্দায় আবদ্ধ নির্দিষ্ট কিছু রঞ্জক (pigment) আবদ্ধ থাকে যারা এই কার্যে সাহায্য করে।

উপরোক্ত এই কাজগুলি ছাড়াও পেশী সংকোচন, অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির সংযোজন, নার্ভ কনডাকশন ইত্যাদি কাজগুলিও মেমব্রেনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

2.1.4 কোষ পর্দার মধ্য দিয়ে চলাচল বা পরিবহণ (Transport across membranes)

কোষপর্দার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বস্তু চলাচল করে। মেমব্রেনের মধ্য দিয়েই কোষ যেমন পুষ্টিগত বস্তুসমূহ গ্রহণ করে তেমনভাবেই বর্জ্যপদার্থ ত্যাগ করে। এর মধ্য দিয়েই জল, উৎসেচকসমূহ, অ্যামাইনো অ্যাসিড, সুগার, প্রোটিন প্রভৃতি চলাচল করে। এই সমস্ত কিছুই ঘটে থাকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে।

মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে পরিবহণ দুই প্রকার হতে পারে। (1) **মিডিয়েটেড** (mediated) এবং (2) **নন মিডিয়েটেড** (non mediated)। ননমিডিয়েটেড পরিবহণ সাধারণ ব্যাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অপরপক্ষে মিডিয়েটেড পরিবহণ নির্দিষ্ট কিছু বহনকারী প্রোটিনের (carrier protein) সাহায্যে হয়ে থাকে।

মিডিয়েটেড পরিবহণ আবার থার্মোডাইনামিক্সের উপর নির্ভর করে দুই প্রকার হতে পারে ঃ

(1) **প্যাসিভ বা নিষ্ক্রিয় মিডিয়েটেড পরিবহণ ঃ** নিষ্ক্রিয় পরিবহণে নির্দিষ্ট কিছু অণু বেশী ঘনত্ব থেকে কম ঘনত্বের দিকে পরিবাহিত হয়।

(2) **অ্যাক্টিভ বা সক্রিয় পরিবহণ ঃ** সক্রিয় পরিবহণে নির্দিষ্ট অণুগুলি কম ঘনত্বের দিক থেকে বেশী ঘনত্বের দিকে পরিবাহিত হয়। যেহেতু এই ঘটনাটি ঘনত্বের বিপরীতে হয়, সেইজন্য এতে শক্তির প্রয়োজন হয়।

● **মিডিয়েটেড পরিবহণের পদ্ধতিসমূহ ঃ**

যে সকল বস্তু তাদের আয়তন বড় হওয়ার জন্য ফসফোলিপিড দ্বিস্তরের মধ্য দিয়ে সহজে যাতায়াত করতে পারে না, তাদেরকে কিছু বহনকারী অণুর সাহায্য নিতে হয়। এদেরকে বহনকারী, পারমিয়েজ, পোর্টার অথবা ট্রান্সপোর্টারও বলা হয়ে থাকে।

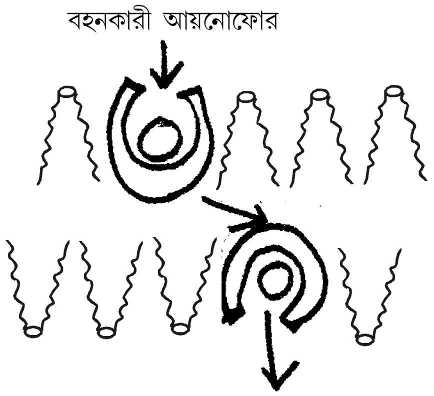

চিত্র 1.5 ঃ বহনকারী আয়নোফোর

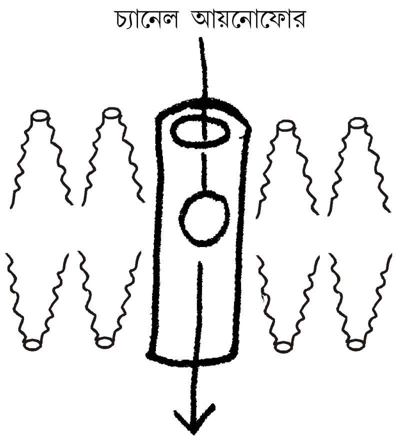

চিত্র 1.6 ঃ চ্যানেল আয়নোফোর

এক ধরনের বহনকারী অণু হল আয়নোফোর (ionophore)। এটি একটি জৈব অণু। বহনকারী আয়নোফোর প্রথমে একটি নির্দিষ্ট আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেটিকে মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত করে এবং পরে আয়নটিকে মেমব্রেনের অন্য প্রান্তে যুক্ত করে।

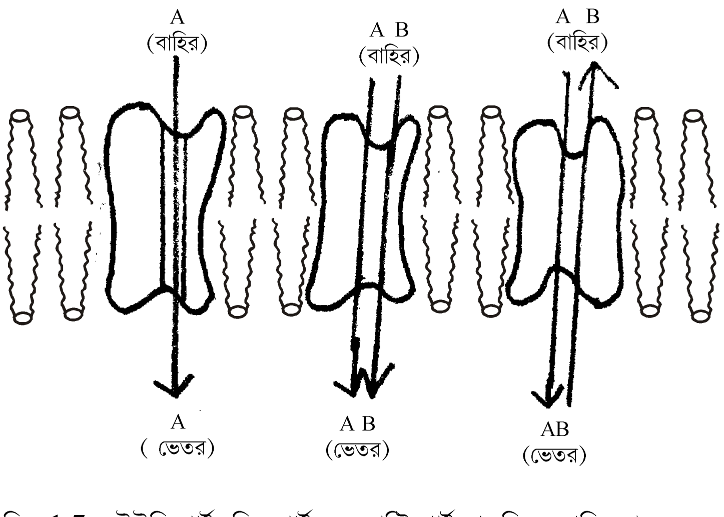

চিত্র 1.7 ঃ ইউনিপোর্ট, সিমপোর্ট ও অ্যান্টিপোর্ট পদ্ধতিতে পরিবহণ

দ্বিতীয় ধরনের আয়নোফোর হল চ্যানেল আয়নোফোর, এটি মেমব্রেনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি প্রণালী বা ছিদ্র তৈরী করে এবং তার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট আয়নগুলি সহজেই চলাচল করতে পারে।

যখন পর্দার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি মাত্র অণু চলাচল করে, তাকে ইউনিপোর্ট (uniport) বলে।

যখন মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দুটি ভিন্ন অণু একই দিকে পরিবাহিত হয়, তাকে সিমপোর্ট (symport) বলে।

যখন মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে দুটি ভিন্ন অণু বিপরীত দিকে একই সঙ্গে পরিবাহিত হয়, তাকে অ্যান্টিপোর্ট (antiport) বলে।

● **ATP চালিত সক্রিয় পরিবহণ** (ATP-driven active transport) ঃ কিছু পদার্থ তাদের ঘনত্বের বিপরীতে পর্দার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পরিবাহিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হয়। ATP-র হাইড্রোলিসিস থেকেই এই প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়। ATPase এই পুরো ঘটনাটিতে সাহায্য করে।

2.1.5 সারাংশ

সকল উন্নত উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের প্রোটোপ্লাজমকে ঘিরে একটি সজীব, সক্রিয়, প্রতিরোধক পর্দা থাকে; একে প্লাজমা মেমব্রেন বা প্লাজমালেমা বলে। প্লাজমা মেমব্রেনের গঠনে ত্রিস্তর কাঠামো থাকে। মধ্যবর্তী লিপিড স্তর এবং উহার দুপাশে প্রোটিন স্তর থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোষের প্লাজমাপর্দা 100 – 215Å পুরু হয়। দুটি লিপিড স্তর দুটি প্রোটিন স্তরের মাঝে স্যান্ডউইচ অবস্থায় থাকে। কোষের প্লাজমা মেমব্রেনের এই গঠনকে একক গঠন এবং রবার্টসনের নামানুসারে একে রবার্টসনের একক ঝিল্লি বলে। প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন সম্পর্কে যে কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতবাদ, রবার্টসনের মতবাদ, একক মতবাদ এবং লিপিডগ্লোবিউলার প্রোটিন মোজেইক মতবাদ, এবং সর্বোপরি ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলই সর্বপ্রথম প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করে। এই মডেলই প্রথম ইন্টিগ্রাল এবং পেরিফেরাল প্রোটিনের কথা বলে। পরবর্তীকালে ফ্রীজ ফ্র্যাকচার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি পদ্ধতি ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের সত্যতা প্রমাণ করে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী এডিডিন ফসফোলিপিড দ্বিস্তরের মধ্যে প্রোটিনের চলাচল তাঁর পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন।

প্লাজমা মেমব্রেন একটি নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দ্রাব্যবস্তু, আয়ন ইত্যাদি চলাচল করে। এছাড়াও প্লাজমা মেমব্রেন বাইরের সিগন্যালে সাড়া দেওয়া, পৃথকীকরণ, বিভিন্ন কোষের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা, শক্তির পরিবহণ ইত্যাদি সম্পন্ন করে।

মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বস্তু চলাচল করে। এই পরিবহণ মিডিয়েটেড এবং ননমিডিয়েটেড এই দুই প্রকার হয়ে থাকে। মিডিয়েটেড পরিবহণ আবার প্যাসিভ এবং অ্যাক্টিভ এই দুই প্রকারের হয়। অণুর সংখ্যা, চলাচল এবং সময়ের উপর নির্ভর করে পরিবহণ আবার ইউনিপোর্ট, সিমপোর্ট এবং অ্যান্টিপোর্ট এই তিন ধরনের হতে পারে।

2.1.6 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) প্লাজমা মেমব্রেন বলতে কি বোঝায়? সংক্ষেপে ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের গঠন বর্ণনা কর।

(২) ড্যানিয়েলি ড্যাভসনের মডেল এবং রবার্টসনের একক ঝিল্লি মতবাদ বলতে কি বোঝ? এই দুটি মতবাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি কি কি?

(৩) ফ্রীজ ফ্র্যাকচার ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপির সাহায্যে কিভাবে ফ্লুয়িড মোজেইক মডেলের সত্যতা প্রমাণিত হয়? এডিডিনের পরীক্ষাটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

(৪) প্লাজমা মেমব্রেনের কার্য্যগুলির সংক্ষেপে বিবরণ দাও।

(৫) প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর পরিবহনের প্রক্রিয়াসমূহের বিস্তারিত বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) কোষের শারীরবৃত্তীয় কাজগুলি কি কি?

(২) ড্যানিয়েলি ও ড্যাভসনের মতবাদটি কি?

(৩) রবার্টসনের একক ঝিল্লি মতবাদটি সংক্ষেপে লেখ।

(৪) ফ্লুয়িড মোজেইক মডেল বলতে কি বোঝ?

(৫) ফসফোলিপিডের মধ্য দিয়ে প্রোটিনের চলাচল একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

(৬) অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ পরিবহণ বলতে কি বোঝ?

(৭) মিডিয়েটিড পরিবহণের পদ্ধতিসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৮) প্লাজমা মেমব্রেন একটি নির্বাচিত ভেদ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে— এর যৌক্তিকতা কতটা?

একক 2.2 ❑ মাইটোকনড্রিয়ার গঠন এবং কাজ

গঠন

2.2.1 প্রস্তাবনা
2.2.2 মাইটোকনড্রিয়ার আকৃতি
2.2.3 মাইটোকনড্রিয়ার আয়তন
2.2.4 মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা
2.2.5 মাইটোকনড্রিয়ার গঠন
2.2.6 মাইটোকনড্রিয়ার উৎসেচক
2.2.7 মাইটোকনড্রিয়ার কাজ
2.2.8 সারাংশ
2.2.9 প্রশ্নাবলী

2.2.1 ভূমিকা

মাইটোকনড্রিয়া কোষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গাণু। প্রায় সমস্ত ইউক্যারিওটিক কোষেই মাইটোকনড্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়। কোষের সকল প্রকার জৈবনিক কার্য্য চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির একমাত্র উৎস হল মাইটোকনড্রিয়া। কারণ মাইটোকনড্রিয়াতেই ATP উৎপন্ন হয় এবং এই ATP-ই শক্তির সঞ্চার ঘটায়। এইজন্য মাইটোকনড্রিয়াকে **কোষের শক্তিঘর** বা পাওয়ার হাউস (Power house) বলা হয়।

1850 খ্রিস্টাব্দে কল্লিকার (Kolliker) সর্বপ্রথম পতঙ্গের পেশীতে মাইটোকনড্রিয়া লক্ষ্য করেন। বিজ্ঞানী অল্টম্যান (Altmann) 1890 খ্রিস্টাব্দে মাইটোকনড্রিয়াকে রঞ্জিত করেন এবং এর নাম দেন বায়োব্লাষ্ট (bioblast)। মাইটোকনড্রিয়াকে আগেকার দিনে কনড্রিওসোমও বলা হোত। 1898 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বেন্ডা (Benda) প্রথম বায়োব্লাষ্টকেই মাইটোকনড্রিয়া নাম দেন। বিজ্ঞানী মিচিলিস (Michaelis) 1900 খ্রিস্টাব্দে জেনাস গ্রীন (Janus green) দিয়ে মাইটোকনড্রিয়াকে রঞ্জিত করেন। 1910 খ্রিস্টাব্দে ওয়ারবার্গ (Warburg) সেন্ট্রিফিউগেজন পদ্ধতির মাধ্যমে মাইটোকনড্রিয়াকে পৃথক করতে সক্ষম হন। 1914 খ্রিস্টাব্দে লিউইস ও লিউইস (Lewis and Lewis) কালচার করা কোষে প্রথম মাইটোকনড্রিয়া দেখেন। 1930 খ্রিস্টাব্দে বেনসলে এবং হোর (Bensley and Hoerr) যকৃৎ কোষ থেকে মাইটোকনড্রিয়া পৃথক করেন। 1948 খ্রিস্টাব্দে হোজবুম (Hogeboom) ও তাঁর সহকর্মীগণ প্রমাণ করেন যে মাইটোকনড্রিয়াই কোষীয় শ্বাসক্রিয়ার অঙ্গাণু (Site of cellular respiration)।

2.2.2 মাইটোকনড্রিয়ার আকৃতি

মাইটোকনড্রিয়ার আকৃতি বেশ পরিবর্তনশীল। মাইটোকনড্রিয়া দণ্ডাকার, সূত্রবৎ, দানাদার বা গোলাকার হতে পারে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরা দণ্ডাকার এবং দানাদার হয়।

2.2.3 মাইটোকনড্রিয়ার আয়তন

মাইটোকনড্রিয়া বিভিন্ন আয়তনের হয়ে থাকে। এদের ব্যাস 0·2 থেকে 1 µm এবং দৈর্ঘ্য 2 থেকে 10 µm পর্যন্ত হতে পারে।

2.2.4 মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা

কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা পরিবর্তনশীল। কোষের কাজের উপরে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা নির্ভর করে। স্বাভাবিক কোষে মাইটোকনড্রিয়ায় সংখ্যা সাধারণত 50 – 5000 পর্যন্ত থাকে। যকৃৎ কোষে মাইটোকনড্রিয়ার সংখ্যা 1000। শুক্রাণুতে আবার 20 – 24 টি মাইটোকনড্রিয়া থাকে। ক্যায়স ক্যায়স (Chaos chaos) নামক বৃহৎ অ্যামিবায় এই সংখ্যা 500,000।

2.2.5 মাইটোকনড্রিয়ার গঠন

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মাইটোকনড্রিয়ার গঠন খুব সুন্দর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়। প্রতিটি মাইটোকনড্রিয়া দুটি পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে। বাইরের পর্দাটিকে বহিঃপর্দা এবং ভেতরের পর্দাটিকে অন্তঃপর্দা বলে। দুটি পর্দাই 60" পুরু হয়। প্রতিটি পর্দাই প্রোটিন-লিপিড-প্রোটিন এই ত্রিস্তর নিয়ে গঠিত। বাইরের এবং

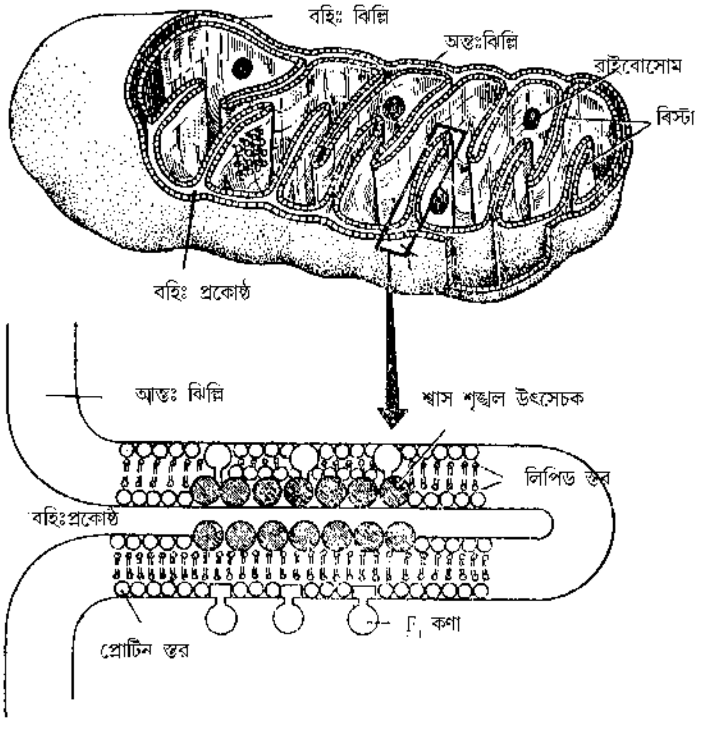

চিত্র 2.1 ঃ মাইটোকনড্রিয়ার ত্রৈমাত্রিক চিত্ররূপ; অংশবিশেষ কেটে তার অন্তর্গঠনের দৃশ্য।

ভেতরের পর্দার মাঝখানে একটি ফাঁকা স্থান থাকে, একে আন্তপর্দা কক্ষ (intermembranal space) বলে। এই স্থানটি 80 – 100" পুরু হয়। ভিতরের পর্দা থেকে আঙুলের মত অনেকগুলি অন্তঃবৃদ্ধি (infolding) মাইটোকনড্রিয়ার ভেতরের গহ্বরের দিকে প্রবেশ করে। এইগুলিকে বিজ্ঞানী পালাডে (Palade), ক্রিষ্টি (cristae) নামকরণ করেন। সুতরাং মাইটোকনড্রিয়াতে আমরা দুটি কক্ষ পাই— একটি কক্ষ হল বাইরের কক্ষ, যা দুটি পর্দার মাঝখানে অবস্থিত এবং অপর একটি হল ভিতরের কক্ষ, যা ভিতরের কক্ষ দ্বারা ঘেরা থাকে। ক্রিষ্টিগুলি এই ভেতরের কক্ষতেই থাকে।

বাইরের কক্ষটি অপেক্ষাকৃত সরু এবং এটি একপ্রকার তরল ধাত্র দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। অপরপক্ষে ভিতরের কক্ষটি বড় এবং একপ্রকার জেলির মত ঘন সমসত্ত্ব ধাত্র দ্বারা পূর্ণ থাকে। একে মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্র বলা হয়।

মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে 50% প্রোটিন, 30–50" ব্যাস বিশিষ্ট কিছু ঘন দানা, রাইবোজোম, DNA এবং ক্রেবস সাইকেলের কিছু দরকারী উৎসেচক থাকে।

বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে জানা গেছে যে বাইরের পর্দাটির বহির্ভাগে এবং ভেতরের পর্দাটির অন্তর্ভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা (particle) লেগে থাকে। বাইরের কণাগুলির আকৃতি ভিতরের কণাগুলির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাইরের কণাগুলির আকৃতি গোলাকার, বৃন্তহীন গড় ব্যাস 150" হয়। এই কণাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকে, ফলে মাইটোকনড্রিয়ার পৃষ্ঠদেশটি বন্ধুর হয়। ভিতরের কণাগুলির আকৃতি ভিন্ন প্রকারের হয়। এদের

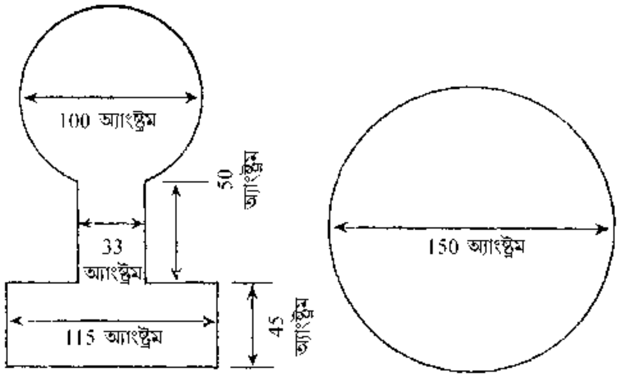

চিত্র 2.2 ঃ মাইটোকনড্রিয়ার বিভিন্ন কণার গঠন; (ক) অন্তর্ভাগের কণার পরিমাপ, (খ) বহির্ভাগের কণার পরিমাপ

দেখতে টেনিসের র‍্যাকেটের মত। এদের ব্যাস গড়ে 70 – 100" হয়। প্রতিটি কণার একটি গোল মাথা (head), একটি বৃন্ত (stalk) এবং আয়তক্ষেত্রাকার একটি গোড়া (base) থাকে। বৃন্তটির দৈর্ঘ্য 50" এবং ব্যাস 30" এবং মাথাটির ব্যাস প্রায় 100"। গোড়ার দৈর্ঘ্য 115" এবং 45"। এইরূপ প্রত্যেকটি কণা পরস্পর থেকে 100Å দূরে থাকে। এই কণাগুলিকে F_1 পার্টিক্‌ল বা কণা অথবা এলিমেন্টারী পার্টিক্‌লও (elementary particle) বলা হয়। পূর্বে F_1 কণাগুলিকে ইলেকট্রন টান্সপোর্ট পার্টিক্‌লস বলে মনে করা হত এবং এতে ইলেকট্রন টান্সপোর্ট চেইনের সমস্ত উৎসেচক আছে বলে মনে করা হত। কিন্তু 1967 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী র‍্যাকার (Racker) পরীক্ষা করে দেখান যে এই কণাগুলিতে ATPase এবং ATP সিনথেটেজ নামক উৎসেচকগুলি থাকে, যেগুলি অক্সিডেশান ও ফসফোরাইলেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা ক্রিস্টির গায়ে কিছু কণিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করেন, এদের অক্সিজোম বলা হয় (oxysome)। এই কণাগুলিই প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রন টান্সপোর্টের সঙ্গে যুক্ত।

মাইটোকন্ড্রিয়ার DNA (mt DNA) ঃ

মাইটোকনড্রিয়াতে DNA-এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই DNA গোলাকার, দ্বিতন্ত্রী এবং প্যাঁচানো অবস্থায় থাকে। কিন্তু কিছু প্রোটোজোয়া এবং ছত্রাকে এই DNA লম্বাটে ধরনের হয়। মাইটোকনড্রিয়ার DNA কে mt DNAও বলা হয়ে থাকে। মাইটোকনড্রিয়ার DNA, নিউক্লিয়াসের DNA থেকে অনেক ছোট হয়। মাইটোকনড্রিয়ার DNA-তে গুয়ানিন এবং সাইটোসিনের পরিমাণ নিউক্লিয়াসের DNA-এর থেকে অনেক বেশী হয়। মাইটোকনড্রিয়াতে DNA পলিমারেজ, RNA পলিমারেজ এবং রাইবোজোমের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে এরা সহজেই প্রোটিন সংশ্লেষ করতে পারে। মাইটোকনড্রিয়া নিজের প্রতিলিপিও গঠন করতে সক্ষম। মাইটোকনড্রিয়াতে t-RNA, r-RNA এবং m-RNA ও পাওয়া যায়।

এই মাইটোকনড্রিয়ার DNA-এর জীনগুলি মেণ্ডেলের বংশগতির নিয়ম মানে না। এদের এক্সট্রাৰোমোজোমাল বা ৰোমোজোম বহির্ভূত জীন বলে। এই ক্ষেত্রে প্রথম অপত্য বংশ শুধুমাত্র মায়ের জীনগত বৈশিষ্ট্যগুলিই পেয়ে থাকে।

2.2.6 মাইটোকনড্রিয়ার উৎসেচক

মাইটোকনড্রিয়ায় প্রায় 70 প্রকার উৎসেচক এবং কো-উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচকগুলি বাইরের এবং ভিতরের পর্দায় এবং ধাত্র বস্তুতে থাকে।

(a) **বাইরের পর্দার উৎসেচকসমূহ ঃ**

মনোঅ্যামাইন অক্সিডেজ, কাইনুরেনিন হাইড্রক্সিলেজ, ফ্যাটি অ্যাসিড CoA, লাইগেজ প্রভৃতি উৎসেচক মাইটোকনড্রিয়ার বাইরের পর্দায় থাকে।

(b) **ভিতরের পর্দার উৎসেচকসমূহ ঃ**

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট পথের উৎসেচকসমূহ, যেমন— নিকোটিনামাইড অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (NAD), ফ্লেভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (FAD), চার প্রকার সাইটোৰোম, কোএনজাইম Q, ATP সিন্থেটেজ, সাক্সিনিক ডিহাইড্রোজিনেজ, অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ ইত্যাদি উৎসেচক এবং কো-উৎসেচক মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের পর্দায় থাকে।

(c) **বাইরের প্রকোষ্ঠের উৎসেচক সমূহ ঃ**

অ্যাডিনাইলেট কাইনেজ এবং নিউক্লিওসাইড ডাইফসফোকাইনেজ প্রভৃতি উৎসেচক বাইরের প্রকোষ্ঠে পাওয়া যায়।

(d) **মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রের উৎসেচকসমূহ ঃ**

ম্যালেট ও আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ, ফিউমারেজ, একোনাইটেজ, সাইট্রেট সিনথেটেজ, α - কিটো অ্যাসিড ডিহাইড্রোজিনেজ প্রভৃতি ৰেবস সাইকেলের উৎসেচকসমূহ এবং β - অক্সিডেশনের উৎসেচকসমূহ মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে পাওয়া যায়।

2.2.7 মাইটোকনড্রিয়ার কাজ

মাইটোকনড্রিয়া জীবকোষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোষের মধ্যে অক্সিজেন, ডিহাইড্রেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম মাইটোকনড্রিয়াতেই ঘটে থাকে।

মাইটোকনড্রিয়ার ৰেবস সাইকেলে, পাইরুভিক অ্যাসিড পুরোপুরি অক্সিডাইজ (Oxidised) হয়ে CO_2 এবং

H_2O তৈরী করে। এই প্রৰিয়ায় কিছু পরিমাণ শক্তিও উৎপন্ন হয়। অক্সিডেশন পদ্ধতিতে উদ্ভুত শক্তি ব্যবহার করে মাইটোকনড্রিয়া উচ্চ শক্তি সম্পন্ন যৌগ ATP উৎপন্ন করে। এই কারণেই মাইটোকনড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বলে।

(1) **শ্বাসকার্য** (Respiration) ঃ কোষের শ্বসনকার্যে মাইটোকনড্রিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্বসনই এর প্রধান কাজ। শ্বসনের প্রধান উদ্দেশ্য হল কোষে সঞ্চিত শর্করা, প্রোটিন এবং ফ্যাট জারিত করে শক্তি উৎপাদন করা। সবাত শ্বসনের সময় কোষের গ্লুকোজ অণুগুলি অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে CO_2, জল এবং শক্তি উৎপন্ন করে। এই উৎপাদিত শক্তির কিছুটা ATP হিসেবে সঞ্চিত হয় এবং কিছুটা অপশক্তি রূপে মুক্ত হয়।

এই বিপাকীয় পথটি অনেকগুলি জৈব রাসায়নিক ধাপের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই ধাপগুলিকে তিনটি জৈব রাসায়নিক পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (ক) গ্লাইকোলাইসিস, (খ) ৰেবস সাইকেল এবং (গ) রেসপিরেটরি চেইন বা ইলেকট্রন পরিবহন তন্ত্র (Electron transport system)। নীচে সংক্ষেপে সবাত শ্বসনের ধাপগুলি দেখান হোল।

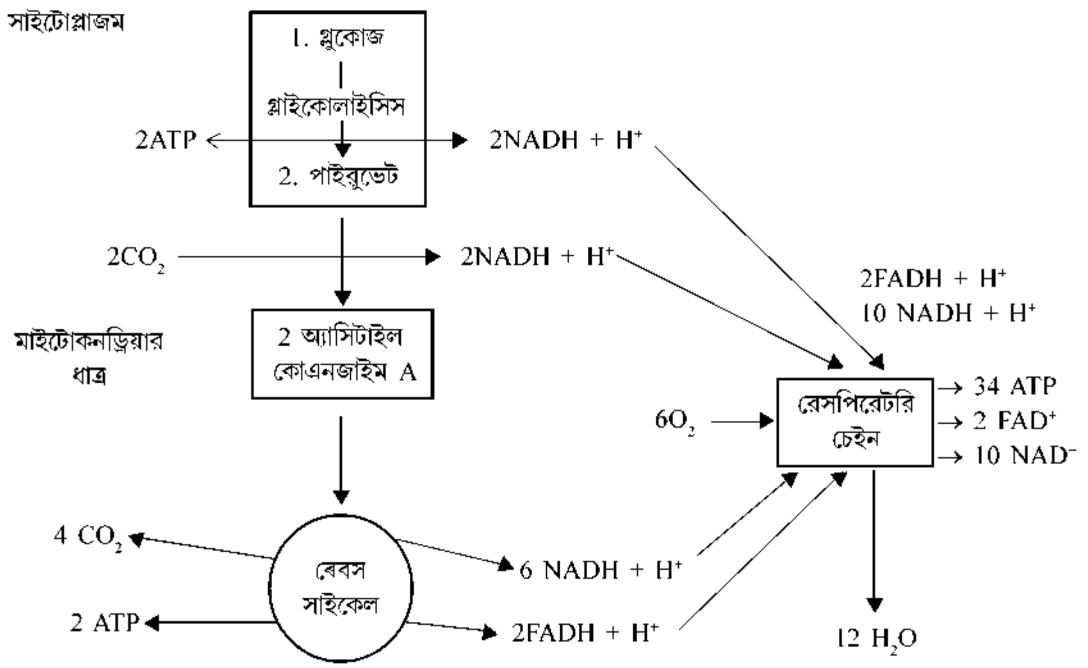

চিত্র 2.3 ঃ সবাত শ্বসনের একটি ছক

(ক) গ্লাইকোলাইসিস (Glycolysis) ঃ

কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে গ্লাইকোলাইসিসের ফলে এক অণু গ্লুকোজ কতগুলি ধাপ অতিক্রম করে দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। প্রত্যেকটি ধাপে একটি করে উৎসেচকের প্রয়োজন হয়। দুই জার্মান প্রাণ-

রসায়নবিদ্, এম্বডেন এবং মেয়ারহফ (Embden-Meyerhoff) প্রথম বিক্রিয়াগুলির প্রত্যেক ধাপের ক্রিয়া কৌশল আবিষ্কার করেন। তাঁদের নামানুসারে, এই ক্রমিক পদার্থগুলির নাম এম্বডেন - মেয়ারহফ পাথওয়েজ (Embden-Meyerhoff pathways)। নিচে এই প্রক্রিয়াটি দেখানো হোল।

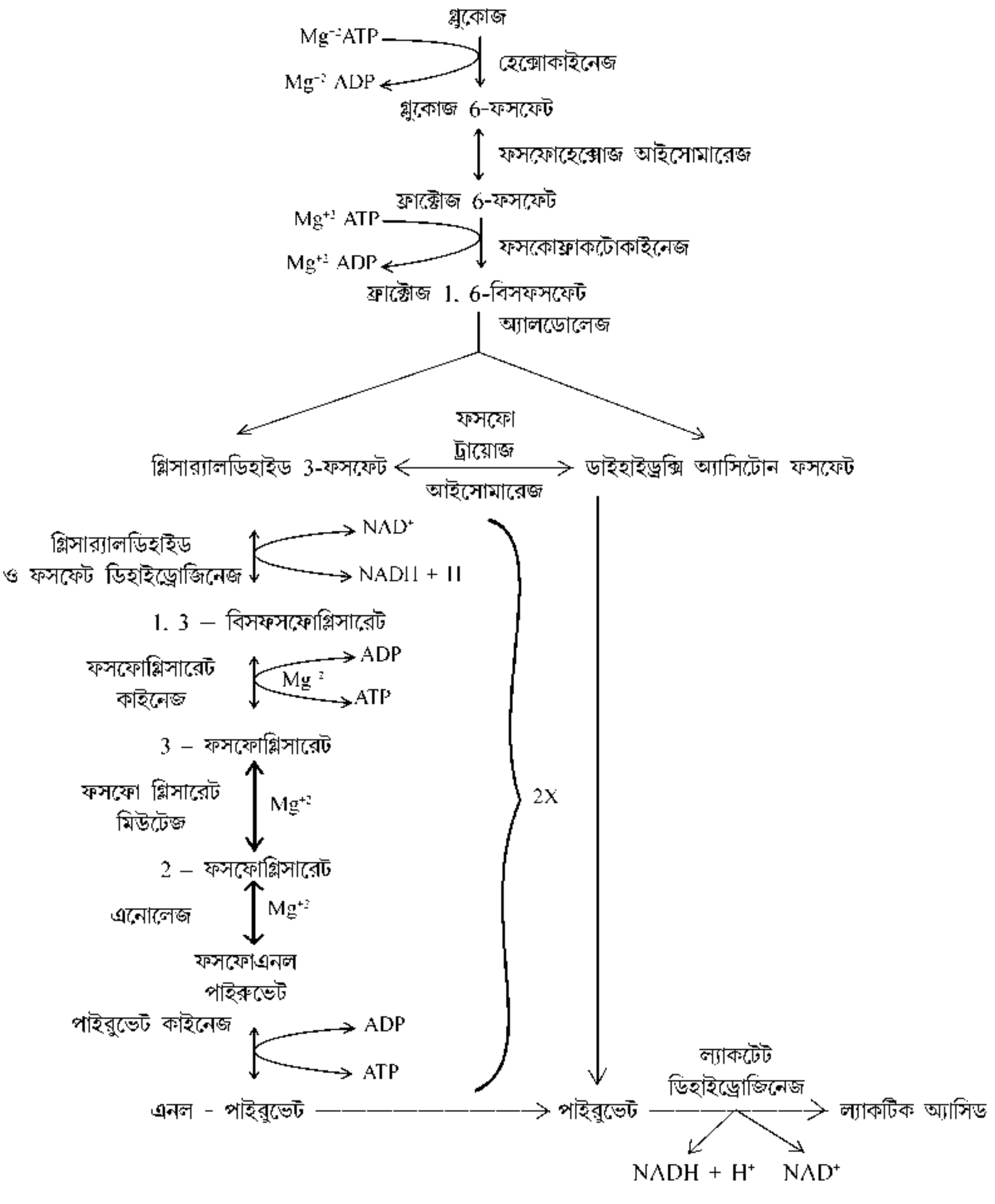

গ্লুকোজ, হেক্সোকাইনেজ উৎসেচকের উপস্থিতিতে এবং Mg^{+} ও ATP এর সাহায্যে গ্লুকোজ 6 ফসফেটে পরিণত হয়। এর পর ফসফোহেক্সোজ আইসোমারেজ উৎসেচক গ্লুকোজ 6 ফসফেটকে ফ্রাক্টোজ 6 ফসফেটে পরিণত করে। ফ্রাক্টোজ 6-ফসফেট ফসফোফ্রাকটো কাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে গ্লিসার‍্যালডিহাইড 3-ফসফেট

এবং ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেটে পরিণত হয়। ঐ যৌগ দুটি ফসফোট্রায়োজ আইসোমারেজের সাহায্যে পরস্পর পরস্পরে পরিবর্তিত হতে পারে। এরপর গ্লিসার‍্যালডিহাইড 3-ফসফেট, গ্লিসার‍্যালডিহাইড 3-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে জারিত হয়ে 1, 3-বিস ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়ায় NAD^- বিজারিত হয়ে NADH এবং H^+ সৃষ্টি করে। ফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ, 1, 3-বিসফসফোগ্লিসারেটকে 3-ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়ায় 1 অণু ATP উৎপন্ন হয়। এর পর ফসফোগ্লিসারেট মিউটেজ এবং Mg^{+2} এর উপস্থিতিতে পূর্ববর্তী যৌগটি 2-ফসফোগ্লিসারেটে পরিণত হয়। 2-ফসফোগ্লিসারেট, এনোলেজ উৎসেচকের সাহায্যে ফসফো এনল পাইরুভেটে পরিণত হয়। Mg^{+2} এই বিক্রিয়ায় সাহায্য করে। এই বিক্রিয়ায় এক অণু H_2O বেরিয়ে যায়। Mg^{+2} এবং পাইরুভেট কাইনেজ উৎসেচক পূর্ববর্তী যৌগটিকে এনলপাইরুভেটে পরিবর্তিত করে। এই পর্যায়ে নির্গত শক্তি ADP-কে ATP-তে পরিণত করে। এই এনল পাইরুভেট পরে পাইরুভেটে পরিবর্তিত হয়।

উপরের এই একই পদ্ধতিতে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট থেকে এক অণু পাইরুভেট তৈরী হয়। সুতরাং, গ্লাইকোলিসিসে 1 অণু গ্লুকোজ থেকে মোট 2 অণু পাইরুভেট তৈরী হয় এবং এই পুরো প্রক্রিয়ায় মোট 4 অণু ATP উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে 2 অণু ATP খরচ হয় এবং সর্বশেষে 2 অণু ATP থাকে।

গ্লাইকোলাইসিসে ATP অণুর উৎপত্তি ঃ (অবাত শ্বসন)

(ক) উৎপত্তি ঃ

ধাপ	ATP অণু
(i) 1, 3-বিস ফসফোগ্লিসারেট → 3-ফসফোগ্লিসারেট	1 × 2 = 2
(ii) ফসফোএনল পাইরুভেট → এনলপাইরুভেট	1 × 2 = 2
	4

(খ) ব্যায় ঃ

(i) গ্লুকোজ → গ্লুকোজ 6-ফসফেট	1
(ii) ফ্রাক্টোজ 6-ফসফেট → ফ্রাক্টোজ 1, 6-বিসফসফেট	1
	মোট জমা = (4 – 2) = 2

(সবাত শ্বসন)

মোট 10টি ATP সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে 2টি খরচ হয়।

(খ) অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন (Oxydative decarboxylation) ঃ

গ্লাইকোলাইসিসের ফলে উৎপাদিত পাইরুভিক অ্যাসিড সবাত শ্বসনে মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে অ্যাসিটাইল কোএনজাইম A (acetyl Co A) তৈরী করে। যে বিক্রিয়ার সাহায্যে এটি হয়, তাকে অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন বলে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একাধারে জারণ (oxidation) হয় এবং CO_2 হ্রাস হয়। এই ধাপে 1 অণু NAD বিজারিত হয়ে $NADH_2$ সৃষ্টি করে।

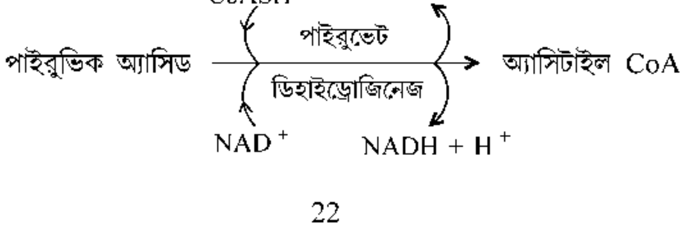

(গ) ক্রেবস চৰ (Krebs cycle) ঃ

1940 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্রেবস (H. A. Krebs) এই জৈব রাসায়নিক প্রৰিয়াটি প্রথম আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে তাঁর নামানুসারে এই বিক্রিয়া পথটির নাম হয় ক্রেবস সাইকেল। একে সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল অথবা ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেলও বলা হয়ে থাকে। নীচে একটি ছকের সাহায্যে প্রক্রিয়াটি দেখানো হোল।

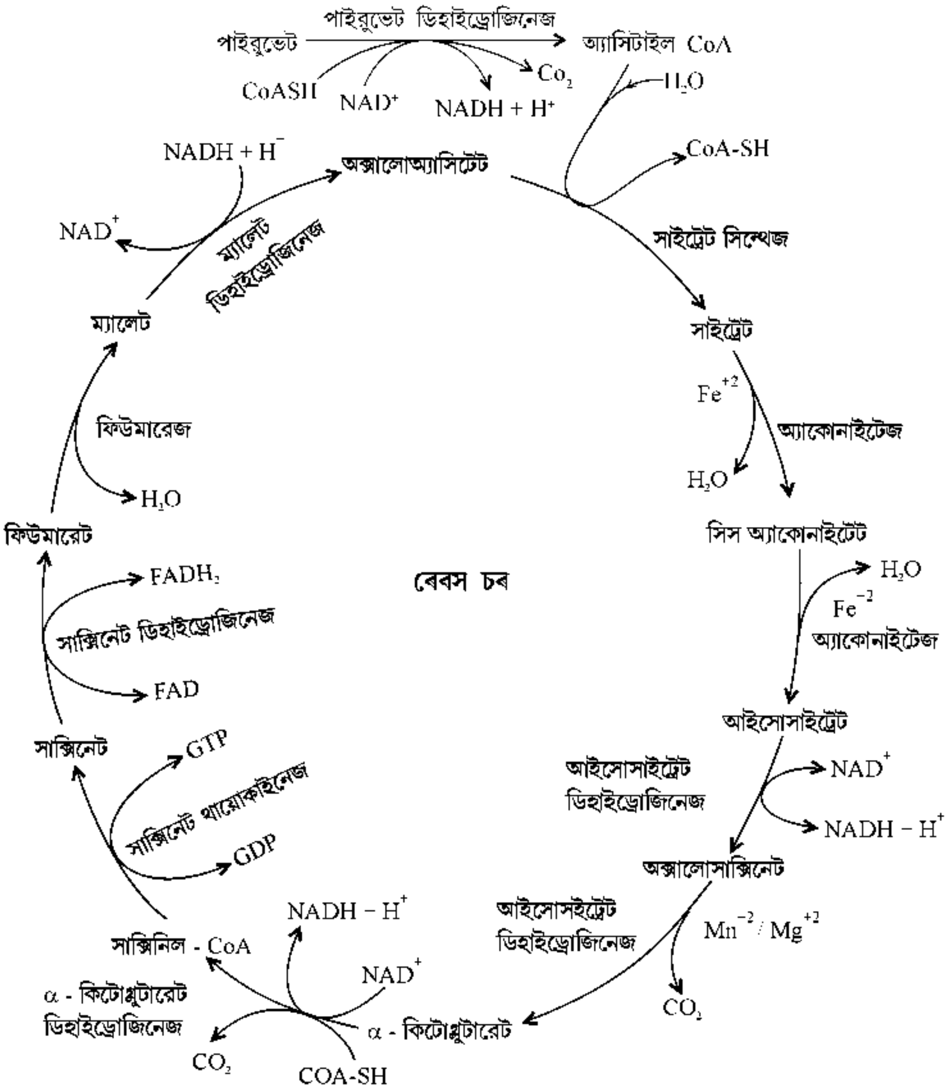

অ্যাসিটাইল কোএনজাইম-A মাইটোকনড্রিয়ায় প্রবেশ করে এবং অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। সাইট্রেট সিন্থেজ নামক উৎসেচক এবং জল এই বিক্রিয়ায় সাহায্য করে। এর পরবর্তী ধাপে সাইট্রিক অ্যাসিড অণু থেকে এক অণু জল বিয়োজিত হয়ে সিস-অ্যাকোনাইটেট উৎপন্ন হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে আবার এক অণু জল যুক্ত হয়ে আইসোসাইট্রেট উৎপন্ন হয়। এই দুটি পর্যায়ে অ্যাকোনাইটেজ

নামক উৎসেচক সাহায্য করে। আইসোসাইট্রেট ডিহাড্রোজিনেজ নামক উৎসেচক NAD কো-উৎসেচকের সাহায্যে আইসোসাইট্রেটকে অক্সালোসাক্সিনেট-এ পরিণত করে। অক্সালোসাক্সিনেট, আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক এবং Mn^{+} ও Mg^{+2} -এর সাহায্যে α-কিটোগ্লুটারেটে রূপান্তরিত হয়। এই বিৰিয়ায় এক অণু CO_2 মুক্ত হয়। α - কিটোগ্লুটারেট পরবর্তী পর্যায়ে α - কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামক উৎসেচক এবং NAD সহ উৎসেচকের উপস্থিতিতে এক অণু CO_2 মুক্ত করে সাক্সিনিল CoA-তে পরিণত হয়। NAD বিজারিত হয়ে $NADH_2$-তে পরিণত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে 3 অণু ATP সৃষ্টি করে। সাক্সিনিল CoA পরবর্তী পর্যায়ে সাক্সিনেট থায়োকাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে সাক্সিনেটে পরিণত হয়। এই বিৰিয়ায় GDP থেকে GTP তৈরী হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে সাক্সিনেট ফিউমারেটে পরিবর্তিত হয়। এই পর্যায়ে FAD বিজারিত হয়ে $FADH_2$ তৈরী করে। ফিউমারেট, ফিউমারেজ নামক উৎসেচকের সাহায্যে ম্যালিক অ্যাসিড বা ম্যালেট তৈরী করে। এই প্রক্রিয়ায় এক অণু জল যুক্ত হয়। ম্যালেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামক উৎসেচক ম্যালিক অ্যাসিডকে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই প্রক্রিয়ায় NAD বিজারিত হয়ে NADH এবং H^{+} তৈরী করে। এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড পূনরায় অ্যাসিটাইল CoA-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাইট্রিক অ্যাসিড তৈরী করে এবং পরে NAD বিজারিত হয়ে ATP সৃষ্টি হয়।

ক্রেবস সাইকেলে 1 অণু পাইরুভিক অ্যাসিড অ্যাসিটাইল CoA হয়ে ক্রেবস সাইকেল অতিক্রম করলে মোট 4 অণু $NADH_2$, 1 অণু $FADH_2$, 1 অণু ATP এবং 3 অণু CO_2 পাওয়া যায়।

(ঘ) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বা রেসপিরেটরি চেইন ঃ

ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলি মাইটোকনড্রিয়ার অন্তর্ভাগের কণাগুলিতে পাওয়া যায়। ক্রেবস সাইকেলের জারণ বিজারণ প্রক্রিয়া চলার সময় ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক সাবস্ট্রেট থেকে হাইড্রোজেন ৱানান্তরিত করে। এই হাইড্রোজেন ক্রমান্বয়ে একসারি উৎসেচকের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়ে অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে জল উৎপাদন করে। এক উৎসেচক থেকে অন্য উৎসেচকে হাইড্রোজেন পরিবহনের সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপাদিত হয়। এই শক্তিই ADP-তে ফসফেট (~ P) সংযোগ করে ATP-তে পরিণত করে। এই ATP সংশ্লেষে যে সকল উৎসেচক কাজ করে তাদের সম্মিলিত কার্যকেই **ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন** বলা হয়।

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O + \text{শ}\text{—}$$

(i) ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক সাবস্ট্রেট থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ করে। হাইড্রোজেন পরমাণু আয়নিত হয়ে (H^{+}) NAD-কে বিজারিত করে।

$$2H \rightarrow 2H \ + 2e^{-} ;$$

$$NAD + 2H^{+} \rightarrow NADH + H^{+}$$

NADH অণু মাইটোকনড্রিয়ার বহিঃপ্রকোষ্ঠে পরিবাহিত হবার সময় F_1 কণার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে রেসপিরেটরি চেইনে প্রবেশ করে।

(ii) NADH জারিত হয়ে NAD^{+}-তে পরিণত হয় এবং H পরমাণু FAD-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে $FADH_2$-তে পরিণত করে। $FADH_2$ থেকে পূনরায় H পরমাণু কোষের মধ্যে H^{+} আয়ন হিসেবে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ইলেকট্রন সাইটোৰোমে পরিবাহিত হয়।

(iii) সকল সবাত শ্বসনকারী কোষেই সাইটোক্রোম থাকে। সাইটোক্রোম হল লৌহযুক্ত একপ্রকার রঞ্জক বিশেষ। এটি উৎসেচকের মত কাজ করে। এই সাইটোৰোম FAD এবং অন্যান্য বাহক উৎসেচক থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে সাইটোৰোম অক্সিডেজ উৎসেচকে স্থানান্তরিত করে। এ পর্যন্ত বহু প্রকার সাইটোক্রোম আবিষ্কৃত হলেও কোষে সাধারণত a, a_3, b, c ও c_2 এই পাঁচ প্রকার সাইটোক্রোম থাকে। FAD থেকে ইলেকট্রন ক্রমান্বয়ে b,

c, c_2, a ও a_3-র মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়। সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এই ইলেকট্রন অক্সিজেনকে দেয় এবং এর ফলে অক্সিজেন সক্রিয় হয় (O^-)। এইরূপে আহিত অক্সিজেন দুই আয়ন H^+ এর সঙ্গে মিলে জল উৎপাদন করে।

রেসপিরেটরি চেইনের ধাপসমূহের চিত্র

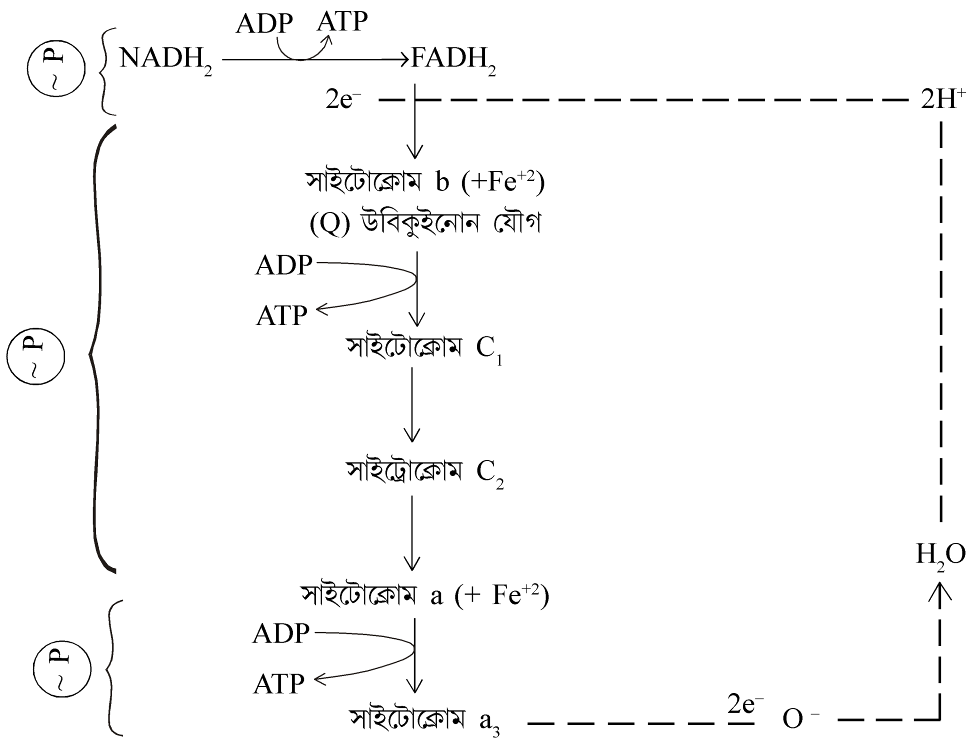

(2) **ATP-র উৎপাদন ঃ**

অধিকাংশ ATP-ই মাইটোকনড্রিয়ায় তৈরী হয়। শ্বাসকার্যের ফলস্বরূপ ATP পাওয়া যায়। ADP-কে ATP-তে রূপান্তরিত হতে হলে কিছু পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। ATPase উৎসেচক এই রূপান্তরে সাহায্য করে। শ্বসনের ফলে যে শক্তি উৎপন্ন হয় সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে, ADP রূপান্তরিত হয়ে ATP-তে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন বলে।

(3) **মাইটোকনড্রিয়ায় সংশ্লেষ ঃ**

বিভিন্ন প্রকার সংশ্লেষ কার্য্য মাইটোকনড্রিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট। এটি প্রোটিন, লিপিড, সাইট্রুলিন, ডিমের কুসুম ইত্যাদি সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে থাকে।

2.2.8 সারাংশ

কোষের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত দণ্ডাকার, সূত্রবৎ, দানাদার বা গোলাকার বস্তুরূপে মাইটোকনড্রিয়া অবস্থান করে। মাইটোকনড্রিয়া, কোষের শ্বাস অঙ্গাণু তথা শক্তি ঘর। মাইটোকনড্রিয়া দুটি পর্দা বেষ্টিত কোষ অঙ্গাণু বিশেষ। এর ভিতরের পর্দাবেষ্টিত কক্ষকে অন্তঃকক্ষ এবং বাইরের কক্ষকে বহিঃকক্ষ বলে। ভিতরের পর্দা থেকে আঙুলের

মত অনেকগুলি অন্তঃবৃদ্ধি মাইটোকনড্রিয়ার ভিতরের গহ্বরের দিকে প্রবেশ করে। এগুলিকে ক্রিষ্টি বলে।

অন্তঃকক্ষের ধাত্রবস্তু জেলির ন্যায় ঘন, কিন্তু বহিঃকক্ষের ধাত্র একটু তরল প্রকৃতির হয়। বহিঃপর্দার বহির্ভাগে এবং অন্তঃপর্দার অন্তভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা লেগে থাকে; এই কণাগুলিকে F_1 কণা বলে।

মাইটোকনড্রিয়ায় গোলাকার, দ্বিতন্ত্রী এবং প্যাচানো DNA-এর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই DNA-কে mt DNA বলা হয়। mt DNA-এর জীনগুলিকে এক্সট্রাক্রোমোজোমাল জীন বলে।

মাইটোকনড্রিয়ায় প্রায় 70 প্রকার উৎসেচক এবং কো-উৎসেচক থাকে। এই উৎসেচকগুলি বাইরের পর্দায়, ভেতরের পর্দায় এবং ধাত্রে অবস্থান করে।

মাইটোকনড্রিয়া জীবকোষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অক্সিডেশন, ডিহাইড্রেশন, অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম ইত্যাদি মাইটোকনড্রিয়াতেই ঘটে থাকে। কোষের প্রকৃত শ্বসন মাইটোকনড্রিয়াতেই হয়ে থাকে। এক অণু গ্লুকোজের গ্লাইকোলাইসিসের ফলে উৎপন্ন দুই অণু পাইরুভিক অ্যাসিড, মাইটোকনড্রিয়ায় ক্রেবস সাইকেল ও ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে প্রবেশ করে, মোট 38 অণু ATP, 12 অণু জল ও 6 অণু CO_2 উৎপন্ন করে। তাছাড়া মাইটোকনড্রিয়ায় প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদিও সংশ্লেষিত হয়।

2.2.9 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) মাইটোকনড্রিয়ার গঠন এবং কার্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(২) mt DNA কি? এর সম্পর্কে যা জান লেখ। মাইটোকনড্রিয়ার বাইরের পর্দা, ভেতরের পর্দা, বাইরের প্রোকষ্ঠ এবং ধাত্রের উৎসেচকগুলির নাম লিখুন।

(৩) গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়াটি একটি ছকের সাহায্যে বর্ণনা করুন। এই প্রক্রিয়াটিতে মোট কত অণু ATP উৎপন্ন হয়?

(৪) অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন বলতে কি বোঝ? ক্রেবস সাইকেল প্রক্রিয়াটি একটি ছকের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

(৫) সংক্ষেপে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনটি বর্ণনা করুন।

(৬) এক অণু গ্লুকোজ সম্পূর্ণরূপে গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস সাইকেল ও রেসপিরেটরি চেইনে প্রবেশ করে মোট কত অণু ATP, জল এবং CO_2 উৎপন্ন করে তা সংক্ষেপে একটি মাত্র ছকের সাহায্যে বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) F_1 পার্টিকেল সম্পর্কে লিখুন।

(২) mt DNA কি?

(৩) মাইটোকনড্রিয়ার ধাত্রে অবস্থিত উৎসেচকগুলির নাম লিখুন।

(৪) ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইনের উৎসেচকসমূহের নাম লিখুন। এগুলি কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

(৫) গ্লাইকোলাইসিস কি? গ্লাইকোলাইসিসের যে ধাপগুলিতে ATP উৎপন্ন হয় তা বর্ণনা কর।

(৬) অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশনে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজিনেজের ভূমিকা কি?

(৭) একটি ছকের সাহায্যে গ্লাইকোলাইসিসে ATP অণুর উৎপত্তি দেখান।

একক 2.3 ❑ ক্রোমোজোমের গঠন

গঠন

2.3.1 প্রস্তাবনা

2.3.2 ক্রোমোজোমের সংখ্যা

2.3.3 ক্রোমোজোমের আয়তন

2.3.4 ক্রোমোজোমের আকৃতি

2.3.5 ক্রোমোজোমের গঠন

2.3.6 ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের আণবিক গঠন

2.3.7 নিউক্লিওজোম মডেল

2.3.8 কিছু অসাধারণ ক্রোমোজোম

2.3.9 সারাংশ

2.3.10 প্রশ্নাবলী

2.3.1 ভূমিকা

ক্রোমোজোম হল নিউক্লিয়াসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার কার্যসমূহ জীববিজ্ঞানীর কাছে অপরিসীম। জীবের বংশগতি নিয়ন্ত্রণে, পরিব্যক্তির যন্ত্র হিসেবে, ভেদের মূল কারণ হিসেবে এবং বিবর্তনের সহায়ক হিসেবে ক্রোমোজোমের গুরুত্ব সর্বাধিক। বংশগতির মূল কণিকা জীনগুলি ক্রোমোজোমেই থাকে। ক্রোমোজোমগুলি পুনরুৎপাদনে (self reproduction) সক্ষম। কোষবিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝা যায় এবং পরীক্ষা করা যায়।

1848 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী হফমেইস্টার (Hofmeister) সর্বপ্রথম কোষে ক্রোমোজোমের উপস্থিতির কথা বলেন। 1875 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী স্ট্রাসবার্জার (Strasburger) এবং 1876 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বলবিয়ানী (Balbiani) কোষ বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসে কিছু তন্তু জাতীয় বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। তারপর 1879 খ্রিস্টাব্দে ফ্লেমিং (Flemming) ঐ তন্তুজাতীয় বস্তুগুলির নামকরণ করেন ক্রোমাটিন (Chromatin)। 1888 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়ালডিয়ার (Waldeyer) প্রথম, নিউক্লিয়াসের ঐ তন্তুজাতীয় বস্তুগুলি নামকরণ করেন ক্রোমোজোম। 1933 খ্রিস্টাব্দে বোভারি (Boveri) প্রমাণ করে দেখান যে ক্রোমোজোমই হল বংশগতির বাহক। 1935 খ্রিস্টাব্দে হিটস (Heitz), 1939 খ্রিস্টাব্দে কাউডা (Kuwada), 1940 খ্রিস্টাব্দে গিট্টার (Geitter) এবং 1948 খ্রিস্টাব্দে কফম্যান (Kaufmann) ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন বর্ণনা করেন। পরবর্তী কালে 1966 খ্রিস্টাব্দে, বিজ্ঞানী ডুপরো (Dupraw) প্রথম ক্রোমোজোমের আলট্রাস্ট্রাকচার বা সুক্ষাতিসূক্ষ গঠনের বর্ণনা করেন। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম প্রতিলিপি গঠন করে।

2.3.2 ক্রোমোজোমের সংখ্যা

যে কোনও একটি প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা একেবারে সুনির্দিষ্ট থাকে এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে ঐ একই সংখ্যায় পরিবাহিত হয়। কিন্তু প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে এই ক্রোমোজোম সংখ্যার তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। ক্রোমোজোমের সংখ্যা প্যারামেসিয়ামে 30–40, হাইড্রায় 32, অ্যাসকারিসে 24, ড্রসোফিলায় 8, গৃহের মাছিতে 12, কলাম্বা লিভিয়ায় 80 এবং মানুষে 46। কোন প্রাণীর কোষের নিউক্লিয়াসে প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের একটি করে প্রতিলিপি থাকলে তাকে হ্যাপ্লয়েড (n) এবং দুইটি করে প্রতিলিপি থাকলে তাকে ডিপ্লয়েড (2n) বলা হয়। হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোমকে, জিনোম (genome) ও বলা হয়। মেটাফেজ এবং অ্যানাফেজ, কোষ বিভাজনের এই দুটি দশায় ক্রোমোজোম সর্বাপেক্ষা সঙ্কুচিত অবস্থায় থাকে, এইজন্য এই দুটি দশায় ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান বোঝা সবথেকে সুবিধার হয়।

2.3.3 ক্রোমোজোমের আয়তন

ক্রোমোজোমের আয়তন বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন রকম হয়। আবার কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশায় একটি প্রজাতির ক্রোমোজোমের আয়তন বিভিন্ন দশায় বিভিন্ন হয়। সাধারণত গড়ে ক্রোমোজোম 0·1 µm থেকে 30 µm লম্বা এবং 0·2 µm থেকে 2 µm চওড়া হয়ে থাকে।

2.3.4 ক্রোমোজোমের আকৃতি

ক্রোমোজোমকে মোটামুটি সিলিণ্ডারের মত দেখতে হয় এবং তারা ক্ষারজাতীয় রঞ্জকের দ্বারা রঞ্জিত হয়। কোষ বিভাজনের বিভিন্ন দশায় ক্রোমোজোমের আকৃতি পরিবর্তিত হয়। ক্রোমোজোমের এক বা একাধিক অংশ চাপা থাকে, যারা সাধারণতঃ রঞ্জক দ্বারা রঞ্জিত হয় না। এদের মধ্যে বড় সংকুচিত স্থানকে সেন্ট্রোমিয়ার বা প্রাথমিক সংকোচ বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই দিকের অংশকে ক্রোমোজোমের বাহু বলে। বাহুর বিশেষ গুণ সম্পন্ন প্রান্ত দুটিকে বলে টেলোমিয়ার।

প্রতিটি নিউক্লিয়াসে অবস্থিত নিউক্লিওলাস সংগঠিত ক্রোমোজোমকে নিউক্লিওলার ক্রোমোজোম বলে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ক্রোমোজোমের আকৃতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায় ঃ

(ক) মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

যে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি ক্রোমোজোমের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে, তাকে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এই ক্রোমোজোম 'V' এর ন্যায় আকার ধারণ করে।

(খ) সাব-মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

যে ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ারটি মাঝামাঝি অবস্থান না করে, একটি পাশে অবস্থান করে, তাকে সাব মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। এই ক্রোমোজোমের বাহু দুটি অসমান হয় এবং অ্যানাফেজ দশায় এদের 'J' বা 'L' অক্ষরের ন্যায় দেখতে হয়।

(গ) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

ক্রোমোজোমের যে কোনও এক প্রান্তের কাছাকাছি সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে তাকে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় একে 'I'-এর ন্যায় দেখতে হয়।

(ঘ) টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম ঃ

কোনও ক্রোমোজোমের যে কোনও এক প্রান্তের শীর্ষদেশে সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে, তাকে টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম বলে। অ্যানাফেজ দশায় এদেরও 'I'-এর ন্যায় দেখতে হয়।

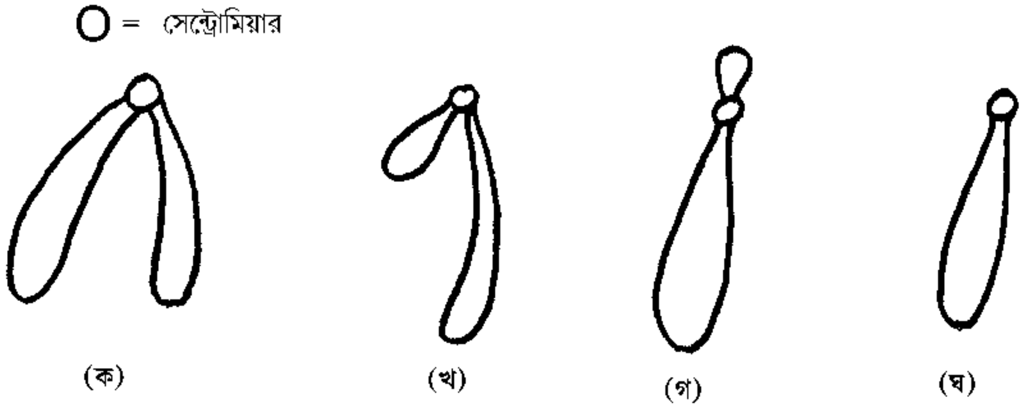

চিত্র 3.1 ঃ সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান ও ক্রোমোজোমের আকৃতি। (ক) মেটাসেন্ট্রিক, (খ) সাবমেটাসেন্ট্রিক, (গ) অ্যাক্রোসেন্ট্রিক, ও (ঘ) টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম

ক্যারিওটাইপ ও ইডিওগ্রাম ঃ কোন প্রজাতির জীব কোষের সমস্ত মেটাফেজ ক্রোমোজোমগুলির একটি সম্পূর্ণ সেটকে ক্যারিওটাইপ বলে। এর থেকে আমরা ক্রোমোজোমগুলির আকার, আকৃতি এবং গঠনের একটি তুলনামূলক চিত্র পাই। এই ক্যারিওটাইপকে ছবির দ্বারাও প্রকাশ করা যায়। একে বলে ইডিওগ্রাম (idiogram)।

2.3.5 ক্রোমোজোমের গঠন

নীচে একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমের গঠন বর্ণনা করা হল। কারণ এই দশায় ক্রোমোজোমকে সবথেকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

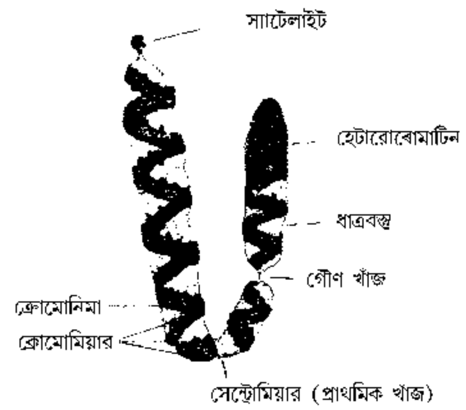

চিত্র 3.2 ঃ একটি মাইটোটিক স্যাট-ক্রোমোজোমের সাধারণ গঠনের চিত্ররূপ।

(ক) ক্রোমোনিমাটা (Chromonemata) ঃ ইন্টারফেজ দশায় প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি প্যাচানো সূত্রবৎ বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, এদের ক্রোমোনিমাটা বলে (chromonema-singular)। 1912 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ভেজ্‌দোভস্কি (vejdovsky) প্রথম এই নামকরণ করেন। ক্রোমোনিমা অনেকগুলি মাইক্রোফাইব্রিল নিয়ে গঠিত। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে, একটি ক্রোমোনিমায় এইরূপ 64 টি মাইক্রোফাইব্রিল থাকে। এই মাইক্রোফাইব্রিলগুলি বা তন্তুগুলি পরস্পর প্যাঁচিয়ে কুণ্ডলীকৃত অবস্থায় থাকে। এই কুণ্ডলীগুলি দুই প্রকারের হতে পারে— **প্যারানেমিক** (paranemic) এবং **প্লেক্টোনেমিক** (plectonemic)। ক্রোমোনিমার যে কুণ্ডলীগুলি অতি সহজে পৃথক করা যায়, তাকে প্যারানেমিক কুণ্ডলী এবং ক্রোমোনিমার যে কুণ্ডলীগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে দড়ির মত পাঁচানো থাকে এবং যাদের সহজে পৃথক করা যায় না, তাদের প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলে। ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্যের উপর, ক্রোমোনিমার কুণ্ডলীর মাত্রাও নির্ভর করে।

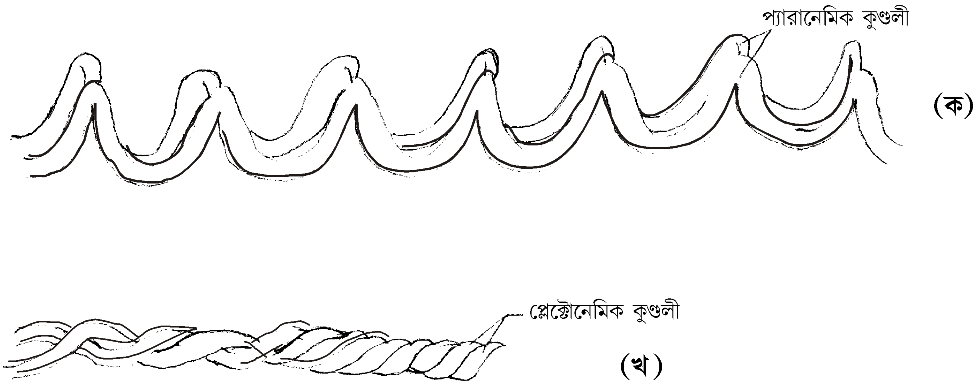

চিত্র 3.3 ঃ ক্রোমোনিমার বিভিন্ন প্রকার কুণ্ডলীকরণ; ক — প্যারানেমিক, খ — প্লেক্টোনেমিক।

প্রকৃতপক্ষে ইন্টারফেজ দশার ক্রোমোটিক তন্তুগুলি, যেগুলি ক্রোমোনিমাটা নামে পরিচিত, কোষ বিভাজনের সময় সেগুলি আরও প্যাঁচানো, ছোট এবং মোটা হয়ে যায়। তখন তাদের বলে **ক্রোমাটিড** (Chromatid)। কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমগুলি লম্বালম্বিভাবে দুটি ভাগে বিভ— হয়, তখন এদের প্রত্যেকটিকে ক্রোমাটিড বলে।

(খ) ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) ঃ কোষ বিভাজনের প্রারম্ভে ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর অনেকগুলি পুতির দানার মত ছোট ছোট অংশ (bead) দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রত্যেকটি ছোট দানাকে ক্রোমোমিয়ার বলে এবং এদের মধ্যবর্তী অংশকে বলে ক্রোমোমিয়ার মধ্যবর্তী (inter chromomere) অঞ্চল। 1876 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বলবিয়ানী (Balbiani) প্রথম এই ক্রোমোমিয়ারের নামকরণ করেন। রীস (Ris) নামক কোষবিজ্ঞানীর মতে ক্রোমোনিমাগুলি কিছুদূর অন্তর অন্তর কুণ্ডলী পাকানোর ফলে ক্রোমোমিয়ার তৈরী হয়।

(গ) ধাত্রবস্তু (Matrix) ঃ

ক্রোমোনিমাগুলি যে ঘন জেলির ন্যায় পদার্থের মধ্যে ডুবে থাকে, তাকে ধাত্রবস্তু বা ম্যাট্রিক্স বলে। ম্যাকক্লিন্টক (McClintock) নামক কোষবিজ্ঞানীর মতে নিউক্লিওলার বস্তু থেকে ক্রোমোজোমের ধাত্রবস্তু উৎপন্ন হয়।

ধাত্রের গঠন এবং কার্যাবলী সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় নি। তবে এটি ক্রোমোনিমাগুলিকে বাণ্ডিল হিসেবে ধরে রাখতে সাহায্য করে, যাতে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোমের বিচলনে কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

অনেকের মতে ধাত্রবস্তু কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোনিমাগুলির সংকোচনে সাহায্য করে এবং জীনগুলিকে একটি আবরণী দ্বারা পৃথক করে রাখে।

ধাত্র বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোষবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও কোষ বিভাজনের কোনও কোনও দশায় ভুট্টা, ট্রিলিয়াম প্রভৃতি উদ্ভিদে এবং পোডিসমা নামক ঘাসফড়িং-এর ক্রোমোজোমের আলোকচিত্রের সাহায্যে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে।

(ঘ) সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) ঃ

সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের একটি অপরিহার্য অংশ। এটি ক্রোমোজোমের প্রাথমিক সংকুচিত জায়গা, যেখানে ক্রোমোজোমের দুটি বাহু মিলিত হয়। বিজ্ঞানী ডারলিংটন (Darlington) প্রথম ঐ সঙ্কুচিত স্থানটিকে সেন্ট্রোমিয়ার নামকরণ করেন। সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমকে বেমতন্তুর বিষুব অঞ্চলে সংযুক্ত করে, সজ্জিত করে এবং ক্রোমোজোম বিচলনে সাহায্য করে। সেন্ট্রোমিয়ার সাধারণত ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর বিভাজিত হয়। সেন্ট্রোমিয়ারে DNA পাওয়া যায়, এদের সেন্ট্রোমেরিক DNA বলে। সেন্ট্রোমিয়ারে একটি চাকতির ন্যায় প্রোটোপ্লাজমিক অংশ দেখতে পাওয়া যায়, একে **কাইনেটোকোর** বলা হয় (kinetochore)। সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানের উপর ক্রোমোজোমের আকৃতি নির্ভর করে; যেমন মেটাসেন্ট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোমেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম।

প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে সাধারণত একটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে (মোনোসেন্ট্রিক)। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি ক্রোমোজোমে একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকে। যে সকল ক্রোমোজোমে দুটি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে তাকে ডাইসেন্ট্রিক (dicentric) এবং দুইয়ের অধিক সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে, তাকে পলিসেন্ট্রিক (polycentric) ক্রোমোজোম বলে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের বিশেষ কোনও অংশে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান না করে, সারা ক্রোমোজোমেই সেন্ট্রোমিয়ারের বৈশিষ্ট্য ছড়ানো থাকে। এই ধরনের সেন্ট্রোমিয়ারকে পরিব্যপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার (diffused centromere) বলে। হেমিপ্টেরা গ্রুপের পতঙ্গদের ক্রোমোজোমে এইরূপ পরিব্যপ্ত সেন্ট্রোমিয়ার পাওয়া যায়।

সেন্ট্রোমিয়ারের আনুবীক্ষণিক গঠন (Ultrastructure of Centromere)

1968 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী ডু প্র (Du Praw) ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সেন্ট্রোমিয়ারের গঠন দেখেন। তাঁর মতে 230 Å ব্যাস বিশিষ্ট প্রায় সাতটি ক্রোমাটিন তন্তু সেন্ট্রোমিয়ারের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের স্ফিরিউলগুলি ক্রোমোজোম ও বেমতন্তুর মাইক্রোটিডবিউল গুলিকে জোড়া লাগাতে আঁঠার মত কাজ করে। জোকেলেনেন (Jokelanen, 1967)-এর মতে এই স্ফিরিউলগুলি ত্রিস্তর বিশিষ্ট (trilaminar) এবং প্রতি স্ফিরিউলের সঙ্গে মাইটোটিক বা মায়োটিক কোষ বিভাজনের সময় বেমতন্তুর চার থেকে সাতটি মাইক্রোটিবিউল যুক্ত থাকে।

(ঙ) ক্রোমোজোমের গৌণ সংকোচন (Secondary constriction) ঃ সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের মুখ্য সংকুচিত স্থান। এছাড়াও ক্রোমোজোমে আরও একটি সংকুচিত স্থান থাকে। একে ক্রোমোজোমের গৌণ সংকুচিত স্থান বলা হয়। এটি নানাভাবে উৎপন্ন হতে পারে; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, নিউক্লিওলার অরগানাইজার (nucleolur organizer) দ্বারা উৎপন্ন হয়। নিউক্লিওলাস ক্রোমোজোমের যে অংশে যুক্ত থাকে, সেই অঞ্চলটিকে নিউক্লিওলার অর্গানাইজিং অঞ্চল (nucleolar organizing region) বলে। কোষ বিভাজনের সময় যখন নিউক্লিওলাস অদৃশ্য হয়ে যায়, তখন ক্রোমোজোমের যে স্থানে নিউক্লিওলাস সংযুক্ত ছিল, সেই স্থানটিতে একটি গৌণ সংকোচ তৈরী হয়। অনেক সময় গৌণ সংকোচ ক্রোমোজোমের একটি প্রান্তে হয় এবং এর ফলে একটি ক্ষুদ্র অংশের সৃষ্টি হয়, যা, বাকী অংশের সাথে কেবলমাত্র একটি সূক্ষ্ম তন্তুর দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এই ক্ষুদ্র অংশটিকে ক্রোমোজোমের **স্যাটেলাইট** (Satellite) বলা হয়। যে ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে, তাকে স্যাট-ক্রোমোজোম (Sat-Chromosome) বলে।

(চ) টেলোমিয়ার (Telomere) ঃ ক্রোমোজোমের দুই বাহুর বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রান্তদুটিকে **টেলোমিয়ার** বলে। 1938 খ্রিস্টাব্দে, মূলার (Muller) টেলোমিয়ার শব্দটি উদ্ভাবন করেন। গঠন এবং আচরণের দিক থেকে ক্রোমোজোমের অন্যান্য অংশগুলির সাথে এই প্রান্তদুটির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। টেলোমিয়ার একটি ক্রোমোজোমকে অন্য ক্রোমোজোমের সাথে জোড়া লাগতে দেয় না। এবং এইভাবে এটি ক্রোমোজোমকে অক্ষুন্ন অবৰায় থাকতে সাহায্য করে। এটি টেলোমিয়ারের একটি বিশেষ গুণ। কোনও ক্রোমোজোম ভেঙ্গে গেলে আবার জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু ভাঙ্গা প্রান্তটি কখনও অন্য ক্রোমোজোমের টেলোমিয়ারের সঙ্গে জোড়া লাগতে পারে না। টেলোমিয়ারের অনুপস্থিতিতে ক্রোমোজোম অস্থায়ী হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়েও যেতে পারে। টেলোমিয়ার হল বিশেষ ভাবে তৈরী একটি অঞ্চল যেটি নিউক্লিয়ার এনভেলাপ বা নিউক্লিয়াসের আবরণীর (nuclear envelope) সঙ্গে যুক্ত থাকে।

2.3.46 ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের আণবিক গঠন (The molecular structure of the Eukaryotic Chromosome)

প্রত্যেকটি ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোম একটি লম্বা দ্বিতন্ত্রী DNA অণু নিয়ে গঠিত এবং DNA-এর দ্বিগুণ পরিমাণ প্রোটিনও এতে থাকে। ক্রোমোজোম প্রকৃতপক্ষে DNA, ক্রোমোজোমাল প্রোটিন এবং RNA-এর দ্বারা তৈরী একটি যৌগ। এই যৌগটিকে বলা হয় ক্রোমাটিন (Chromatin)।

ক্রোমাটিন সাধারণত দুই প্রকারের হয়, **ইউক্রোমাটিন** (euchromatin) এবং **হেটারোক্রোমাটিন** (hetero-chromatin)। ইউক্রোমাটিন, রঞ্জকে হালকা ভাবে রঞ্জিত হয়। ইন্টারফেজ দশায় এটি অকুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে কিন্তু মাইটোসিসে এটি কুণ্ডলীকৃত হতে থাকে। ইউক্রোমাটিনই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই জিনোম তৈরী করে। অপরপক্ষে হেটারোৰোমাটিন রঞ্জকে গাঢ় ভাবে রঞ্জিত হয়, কারণ এটি ইউক্রোমাটিনের থেকে বেশী কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। ইউক্রোমাটিন জেনেটিক দিক থেকে সৰিয় (এর বহনকারী জিনগুলি প্রকাশিত হয়) এবং হেটারোক্রোমাটিন জেনেটিক দিক থেকে নিষ্ক্রিয় হয় (কারণ এটি কোনও জীন বহন করে না, বা করলেও সেগুলি নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না)।

প্রায় সমস্ত ইউক্যারিওটের সেন্ট্রোমিয়ার এবং টেলোমিয়ারে হেটারোক্রোমাটিন দেখতে পাওয়া যায়।

ৰোমাটিনে, DNA-এর সঙ্গে দুটি প্রধান প্রোটিন দেখতে পাওয়া যায়। এদের একটি হিস্টোন (Histone) প্রোটিন এবং অন্যটি হল ননহিস্টোন প্রোটিন (Nonhistone)। ক্রোমোজোমের ভৌত গঠনে এই প্রোটিন দুটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

হিস্টোন প্রোটিন ঃ ক্রোমোজোমে হিস্টোন প্রোটিনের পরিমাণ সবথেকে বেশী থাকে। হিস্টোন হল একধরনের ক্ষুদ্র, ক্ষারীয় প্রোটিন, অর্থাৎ এরা ধনাত্মক হয়। এর ফলে হিস্টোন, ঋণাত্মক DNA-এর সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। হিস্টোন প্রোটিনে ২৩ শতাংশ লাইসিন এবং আর্জিনিন অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে।

ইউক্যারিওটিক DNA-তে 5 ধরনের হিস্টোন প্রোটিন থাকে— H_1, H_2, H_3B, H_3 এবং H_4। H_1 হিস্টোন প্রোটিন অন্য চার প্রকার হিস্টোন প্রোটিনের থেকে গঠন এবং কার্যের দিক থেকে পৃথক হয়।

ননহিস্টোন প্রোটিন ঃ DNA-এর সঙ্গে হিস্টোন ছাড়া অন্য যে ধরনের প্রোটিন থাকে, তা হল ননহিস্টোন প্রোটিন। এরা হিস্টোনের থেকে পরিমাণে কম থাকে। কিছু ননহিস্টোন প্রোটিন গঠনগত কাজ করলেও বেশীরভাগ ননহিস্টোন প্রোটিনই DNA-র প্রতিলিপি গঠনে, RNA তৈরীতে এবং প্রোটিন সংশ্লেষে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

হিস্টোন প্রোটিন, ননহিস্টোন প্রোটিনের থেকে ভিন্ন ধরনের হয়। ননহিস্টোন প্রোটিন হল অ্যাসিডিক প্রোটিন। তাই এরা বেসিক হিস্টোন প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

2.3.7 নিউক্লিওজোম মডেল (Nuclesome model)

প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের দ্বিতন্ত্রী DNA নিউক্লিয়াসের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত অবৰায় থাকে। এখন প্রশ্ন হল, কি ভাবে, কিছু মাইক্রোমিটার ব্যাস যু— নিউক্লিয়াসের মধ্যে কয়েক মিলিমিটার বা সেন্টিমিটার লম্বা ক্রোমোজোম কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, হিস্টোনগুলিকে কেন্দ্র করে DNA তার চারদিকে জড়িয়ে থাকে এবং মেটাফেজ দশায় তারা সবচেয়ে বেশী মাত্রায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। DNA এবং প্রোটিনের এই গঠনকেই নিউক্লিওজোম বলা হয়। নিউক্লিওজোম DNA চার ধরনের হিস্টোন প্রোটিন নিয়ে গঠিত H_2A, H_2B, H_3 এবং H_4। নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রে এই প্রত্যেকটি প্রোটিনের একটি করে প্রতিলিপি থাকে এবং একে হিস্টোন অক্টামার বলা হয়। একে দেখতে সিলিন্ডারের মত এবং এটি চওড়ায় 11 nm এবং 5·7 nm পুরু হয়। এই হিস্টোন অক্টামারে H_1 হিস্টোন প্রোটিনের কোনও ভূমিকা থাকে না। হিস্টোন অক্টামারের চারপাশে একটি সম্পূর্ণ এবং অপর একটি এক তৃতীয়াংশ পাকে 146 বেস পেয়ার DNA থাকে। H_1 হিস্টোন প্রোটিন নিউক্লিওজোমের কেন্দ্রে থাকে না। এটি নিউক্লিওজোমের চারিদিকে DNA-কে জড়িয়ে রাখতেও কোনোভাবে সাহায্য করে না। DNA যেৰানে নিউক্লিওজোমে প্রবেশ করে এবং নিউক্লিয়াস থেকে বের হয়, ঠিক সেই ৰানে H_1 হিস্টোন প্রোটিন DNA-র সঙ্গে যুক্ত হয়। যে DNA, দুটি নিউক্লিওজোমকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে, তাকে লিঙ্কার (linker) DNA বলে।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা গেছে যে DNA প্রোটিন যৌগে ক্রোমাটিন তন্তুগুলি 10 nm ব্যাসবিশিষ্ট হয়। ক্রোমাটিন তন্তুগুলিকে এই যন্ত্রের সাহায্যে পুঁতির মালার মত দেখায় (beads on a string), যেখানে পুঁতিগুলি হল নিউক্লিওজোম এবং পুঁতিগুলির মধ্যবর্তী সংযোগকারী সূতা হল লিঙ্কার DNA।

নিউক্লিওজোমের পরে উচ্চপর্যায়ে আমরা DNA-এবং প্রোটিনের যে যৌগটি পাই, তাতে ক্রোমাটিন তন্তুগুলি 30 nm ব্যাস বিশিষ্ট হয়। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা দেখান যে এর পরে আমরা 300 nm ব্যাস বিশিষ্ট ক্রোমাটিন

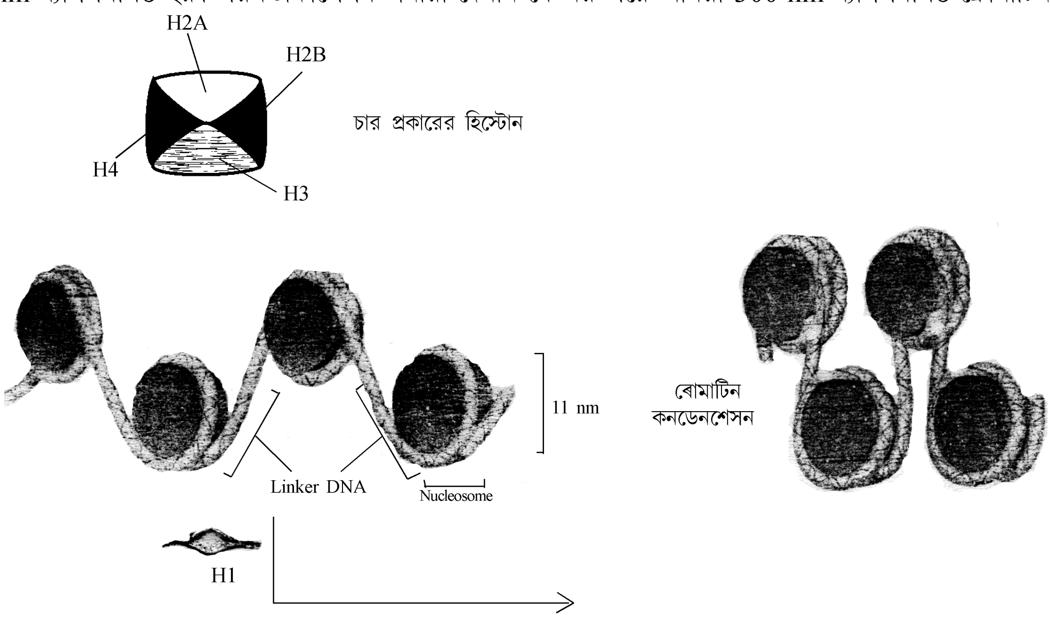

চিত্র 3.4 ঃ নিউক্লিওজোম মডেল

তন্তু এবং সর্বপরি 700 nm ব্যাসবিশিষ্ট ক্রোমাটিন তন্তু পেতে পারি যেটা পর্যায়ক্রমে ইন্টারফেজ দশায় এবং মেটাফেজ দশায় দেখতে পাওয়া যায়।

মেটাফেজ ক্রোমোজোমে আমরা নিউক্লিওজোমের বদলে DNA-এর লুপের মত ডোমেন দেখতে পাই (looped domain)। প্রতিটি লুপে DNA-এর পরিমাণ 30000 থেকে 90000 bp হতে পারে। এই ডোমেনগুলি নন হিস্টোন প্রোটিন স্কেফোল্ডের (Scaffold) সঙ্গে যুক্ত থাকে।

নিউক্লিয়ার আবরণীর মধ্যে নিউক্লিয়ার ধাত্র (matrix) থাকে। ইন্টারফেজে ক্রোমাটিন এই ধাত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ধাত্র প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরী। এই ধাত্রের মধ্যে DNA, প্রোটিনের সঙ্গে MAR

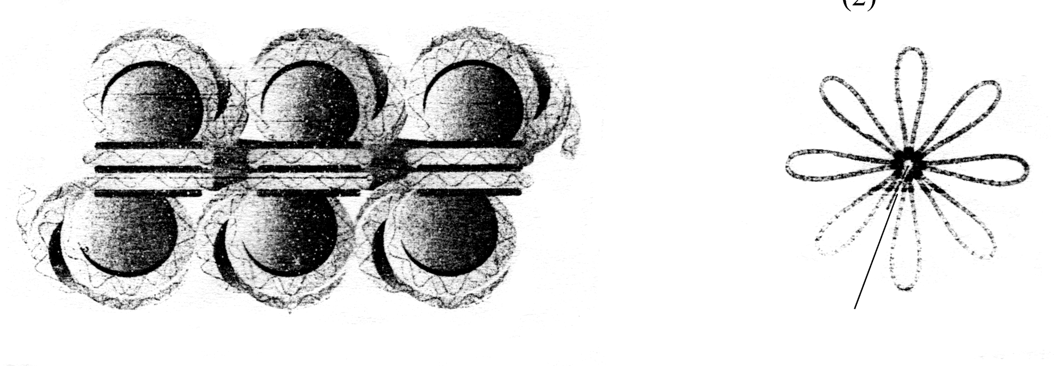

চিত্র 3.5 ঃ (1) নিউক্লিওজোমে 30 nm ব্যাস বিশিষ্ট ৰোমাটিন তন্তু,
(2) মেটাফেজ ক্রোমোজোমের লুপের মত ডোমেন

(Matrix Attachment Regions) নামক একটি স্থানে যুক্ত থাকে। কোষের এই ধাত্রের মধ্যেই DNAর প্রতিলিপি গঠন এবং প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য দরকারী উৎসেচকগুলি পাওয়া যায়।

2.3.8 কিছু অসাধারণ ক্রোমোজোম

এতক্ষণ ক্রোমোজোমের যে গঠনের কথা আলোচনা করা হল, তা মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সময় সাধারণভাবে দৃষ্ট ক্রোমোজোমের গঠন। এই সাধারণ ক্রোমোজোম ছাড়া আরও কয়েক প্রকার অসাধারণ ক্রোমোজোম কোন কোন জীবের বিশেষ বিশেষ অংশে দেখা যায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পলিটিন ক্রোমোজোম এবং ল্যাম্পব্রাশ ৰোমোজোম।

● **পলিটিন ক্রোমোজোম ঃ** ডিপটেরা বর্গের কিছু পতঙ্গের (মাছি, মশা ইত্যাদি), কিছু নির্দিষ্ট কলায় (tissue) কোষের নিউক্লিয়াসগুলি আকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; একটি নিউক্লিয়াসের প্রতিটি ক্রোমোজোমের একের থেকে বেশী বার রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপি গঠনের ফলেই এইরূপ ঘটনা ঘটে। একে **এন্ডোপলিপ্লয়ডি** বলা হয়। এই ঘটনায় প্রতিটি নতুন ক্রোমোজোম তৈরী হওয়ার পর, সেটি পূর্বের ক্রোমোজোমটির থেকে পৃথক না হয়ে বরং পরপর লম্বালম্বিভাবে একসাথে জুড়ে থাকে। এর ফলে ক্রোমোজোমগুলি অত্যন্ত মোটা এবং লম্বা হয়। এই ক্রোমোজোমগুলিকেই **পলিটিন ক্রোমোজোম** বলে। সমান্তরাল ভাবে দ্বিত্বকরণ (parallel duplication) হওয়ার ফলেই এই ক্রোমোজোমগুলিকে পলিটিন ক্রোমোজোম বলা হয়।

পলিটিন ক্রোমোজোমগুলির ব্যাস সব জায়গায় এক হয় না, কোথাও সরু হয় আবার কোথাও ফুলে থাকে। সরু অংশটিকে ওয়েস্ট (Waist) এবং ফোলা অংশটিকে পাফ (Puff) বলে।

পলিটিন ক্রোমোজোমগুলিতে আড়াআড়িভাবে সজ্জিত বহু ঘন ডোরা এবং হালকা বর্ণের আন্তরডোরা (bands and interbands) অঞ্চল থাকে। সাধারণ ক্রোমোজোম-রঞ্জকে কতকগুলি অঞ্চল কালো ফিতার মত ক্রোমোজোমের সারা প্রস্থ জুড়ে থাকে, এইগুলি হল ঘন ডোরা (Dark band) অঞ্চল। এই ঘন ডোরা অঞ্চলে অধিক পরিমাণে DNA এবং সামান্য পরিমাণ RNA ও প্রোটিন থাকে। এই অঞ্চলটি ইউক্রোমাটিন অঞ্চল। অপরপক্ষে হালকা আন্তরডোরা অঞ্চলটি হল তন্তুময়, হেটোরোক্রোমাটিন অঞ্চল এবং RNA ও প্রোটিনে সমৃদ্ধ। এই অঞ্চলে স্বল্প পরিমাণ DNA থাকে।

বিভিন্ন প্রজাতিতে ব্যান্ডের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে এই সংখ্যার কোনও তারতম্য হয় না, সেটি নির্দিষ্ট থাকে। ড্রসোফিলা নামক মাছির শূককীটের লালাগ্রন্থি কোষে আমরা পলিটিন ক্রোমোজোম দেখতে পাই। এদের ক্রোমোজোমে প্রায় 5000 ব্যাণ্ড আছে। কখনও কখনও ঘনডোরা (band) অঞ্চলগুলি ফুলে যায় এবং ক্রোমোজোম পাফ (Puff) সৃষ্টি করে। ক্রোমোজোমের এই পাফ সৃষ্টি হওয়া

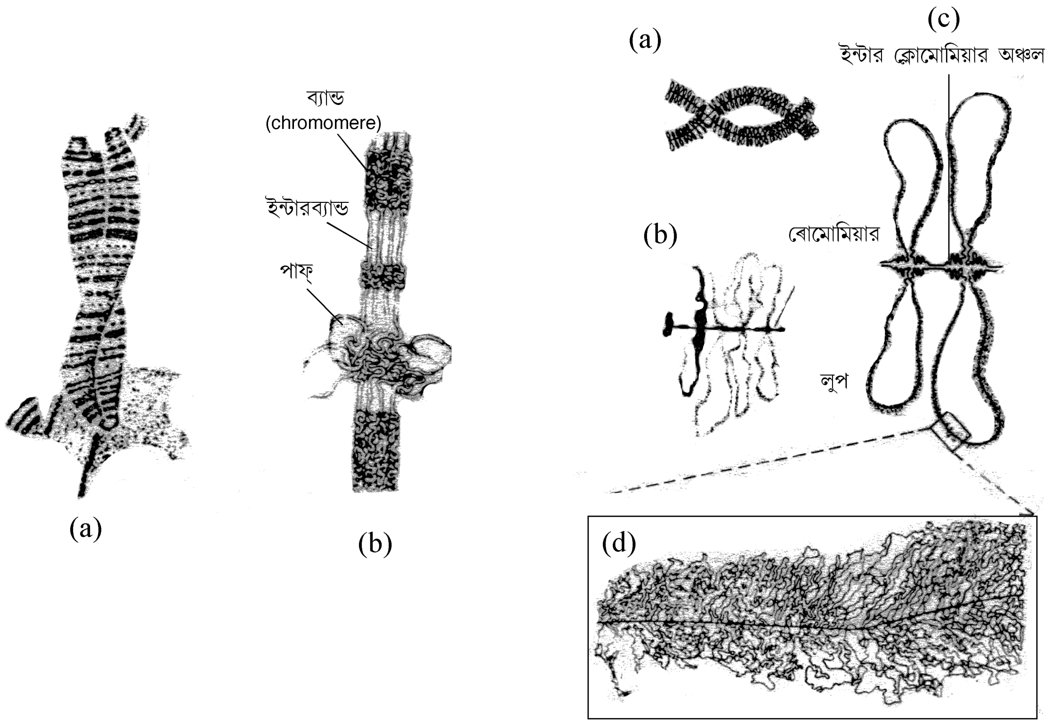

চিত্র 3.6 ঃ (1) (a) ড্রসোফিলা মাছির লার্ভার স্যালাইভারি ক্রোমোজোম;
(b) পলিটিন ক্রোমোজোমের সূক্ষতম গঠন
(2) *Triturus*-এর ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমের সূক্ষতম গঠন;

জীন নিয়ন্ত্রিত এবং চক্রাকারে সংঘটিত হয়। RNA এবং প্রোটিন সংশ্লেষের সঙ্গে এই পাক সৃষ্টির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। নির্দিষ্ট স্থানে DNA কুণ্ডলীর প্যাঁচ খুলে যাওয়া, RNA-র সংশ্লেষ এবং এই RNA থেকে প্রোটিনের সঞ্চয় ইত্যাদি ঘটনার ফলেই ক্রোমোজোম পাফ সৃষ্টি হয়।

কখনও কখনও পলিটিন ক্রোমোজোমের ক্রোমানিমাগুলি সারিবদ্ধভাবে বহু পার্শ্ব ভাঁজ সৃষ্টি করে। এই পার্শ্ব ভাঁজগুলি অঙ্গুরির মত বিন্যস্ত হলে তাকে বালবিয়ানি অঙ্গুরি (Balbiani ring) বলে। বালবিয়ানি অঙ্গুরিতে প্রচুর পরিমাণে DNA ও RNA থাকে। ক্রোমোজোম পাফের সৃষ্টি ও কাজ এবং বালবিয়ানি অঙ্গুরির সৃষ্টি ও কাজ একই প্রকারের।

ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম (Lamp brush chromosome) ঃ

কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীর উসাইট (Oocyte) বা ডিম্বকোষে সঞ্চিত কুসুম (yolk) বেশী থাকে, তাদের ডিম্বকোষগুলি অনেক সময় ফুলে মোটা হয়ে যায় (সাধারণত বৃদ্ধি দশায়) এবং কোষের নিউক্লিয়াসও সাথে সাথে বড় হতে থাকে। এই সকল নিউক্লিয়াসে মিয়োটিক প্রফেজ দশার ক্রোমোজোমগুলি অসাধারণ লম্বা হয় এবং এদের পাশ থেকে অনেকগুলি পার্শ্ব ফাঁস (lateral loops) বিকীর্ণ হয়ে টেস্টটিউব ব্রাশের মত বিন্যস্ত থাকে। এইরূপ ক্রোমোজোমকে **ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম** বলে। রূকার্ট (Ruckert) নামক এক বিজ্ঞানী 1892 খ্রিস্টাব্দে প্রথম এইরূপ ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।

ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোমই লম্বায় সবচেয়ে বড় হয়। ইউরোডেল উসাইটে এটি প্রায় 5900 μm পর্যন্ত হয়। দ্বিতন্ত্রী ক্রোমোজোমের প্রতিটি ক্রোমোমিয়ার থেকে এক জোড়া পার্শ্ব ফাঁস তৈরী হয়। মিয়োটিক প্রোফেজের শেষের দিকে এই পার্শ্বফাঁসগুলি অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং ক্রোমোজোমগুলি সংকুচিত হয়ে যায়। এই পার্শ্বফাঁসগুলিতে প্রচুর পরিমাণে RNA এবং প্রোটিনের বন্ধন পাওয়া গেছে, যেগুলি কোষ তার প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এই RNAগুলি mRNA ধরনের। এই পার্শ্ব ফাঁসগুলির কাছেই প্রোটিন এবং কুসুম সংশ্লেষ হয়। এই সংশ্লেষিত বস্তুগুলি পার্শ্ব ফাঁস থেকে দূরে সরে যাবার পরেই পার্শ্বফাঁসগুলি সঙ্কুচিত হয়। বিজ্ঞানী গল এবং কালান (Gall and Callan) 1963-তে প্রথম এই অবস্থা লক্ষ্য করেন।

2.3.9 সারাংশ

জীবের বংশগতি নিয়ন্ত্রণে ক্রোমোজোমের ভূমিকা অপরিসীম। জীবের যে কোন প্রজাতিতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। দেহকোষ বা সোমাটিক কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড (2n) এবং শুক্রাণু বা ডিম্বাণুতে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড (n) হয়। ক্রোমোজোমে DNA-এর পরিমাণের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভিন্ন আকৃতির ক্রামোজোম সৃষ্টি হয়।

আকৃতি অনুযায়ী ক্রোমোজোম চার প্রকারের হয়ে থাকে — মেটাসেন্টিক, সাব-মেটাসেন্ট্রিক, অ্যাক্রোসেন্ট্রিক এবং টেলোসেন্ট্রিক। একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমের গঠনে, ধাত্রবস্তুতে অবস্থিত অনেকগুলি পেঁচানো সুতোর মতো ক্রোমোনিমা দেখা যায়। বাইরের আবরণীর ন্যায় বস্তুটিকে বলে পেলিকল। ক্রোমোনিমাগুলি কতগুলি মাইক্রোফাইব্রিল নিয়ে গঠিত। মাইক্রোফাইব্রিলগুলি প্যারানেমিক অথবা প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলীতে থাকে।

ক্রোমোজোমের দুটি বাহুর সংযোগ স্থলকে সেন্ট্রোমিয়ার বলে। এটিই ক্রোমোজোমের মুখ্য সংকোচ। এছাড়াও ক্রোমোজোমে গৌণ সংকোচও দেখতে পাওয়া যায়। ক্রোমোজোমের দুই বাহুর বিশেষ গুণসম্পন্ন প্রান্ত দুটিকে টেলোমিয়ার বলা হয়।

ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের DNA, RNA এবং ক্রোমোজোমাল প্রোটিন নিয়ে একটি যৌগ গঠিত হয়, যাকে

ক্রোমাটিন বলা হয়। ৎক্রোমাটিন আবার দুই প্রকারের হয়, ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিন। এই প্রোটিনগুলিকে DNA জড়িয়ে থাকে এবং নিউক্লিওজোম মডেল গঠন করে।

কয়েক প্রকার অসাধারণ ক্রোমোজোমের মধ্যে ল্যাম্পব্রাশ এবং পলিটিন ক্রোমোজোম অন্যতম।

2.3.10 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) আকৃতি অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ করুন, সংক্ষেপে একটি মেটাফেজ ক্রোমোজোমের গঠন বর্ণনা করুন।

(২) ইউক্যারিওটিক ক্রোমোজোমের আণবিক গঠন চিত্রসহ আলোচনা করুন।

(৩) পলিটিন এবং ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম সম্পর্কে যা জান লিখুন।

(৪) (ক) প্যারানেমিক এবং প্লেক্টোনেমিক কুণ্ডলী বলতে কি বোঝো? (খ) ক্রোমোজোমের মূখ্য এবং গৌণ সংকোচের মধ্যে তফাৎ কি? (গ) ইউক্রোমাটিন এবং হেটারোক্রোমাটিনের পার্থক্যগুলি লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের আলট্রা গঠন বর্ণনা করুন।

(২) আকৃতি অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ করুন।

(৩) টেলোমিয়ারের বিশেষ ধর্মগুলি কি কি?

(৪) ক্রোমোজোমের স্যাটেলাইট বলতে কি বোঝেন?

(৫) হিস্টোন এবং ননহিস্টোন প্রোটিনের ধর্মগুলি লিখুন।

(৬) পলিটিন ক্রোমোজোমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(৭) ল্যাম্পব্রাশ ক্রোমোজোম বলতে কি বোঝো? এটি কোথায় দেখতে পাওয়া যায়?

একক 2.4 ❑ DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠন

গঠন

2.4.1 প্রস্তাবনা

2.4.2 DNA-এর ভৌত গঠন

2.4.3 DNA-ই বংশগতির ধারক এবং বাহক

2.4.4 রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন

2.4.5 সারাংশ

2.4.6 প্রশ্নাবলী

2.4.1 প্রস্তাবনা

DNA এবং RNA হল ম্যাক্রোমলিকিউলস, অর্থাৎ তাদের আণবিক ওজন হল কমপক্ষে কয়েক হাজার ডালটন (1 ডালটন = $1{\cdot}67 \times 10^{-24}$ gm)। DNA এবং RNA চারটি ভিন্ন মনোমেরিক ইউনিট নিয়ে গঠিত। যাদের বলা হয় নিউক্লিওটাইডস। প্রত্যেকটি নিউক্লিওটাইড তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত ঃ (1) একটি পেন্টোজ সুগার, (2) একটি নাইট্রোজেন ঘটিত বেস এবং (3) একটি ফসফেট গ্রুপ।

RNA-এর পেন্টোজ সুগার হল রাইবোজ এবং DNA-এর হল ডি-অক্সিরাইবোজ।

নাইট্রোজেন ঘটিত বেস আবার দুই প্রকারের হয়, পিউরিন এবং পিরিমিডিন। DNA-এ তে অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) এই দুই ধরনের পিউরিন এবং থাইমিন (T) ও সাইটোসিন (C) এই দুই ধরনের পিরিমিডিন পাওয়া যায়। RNA-এ তে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এই তিনটিই থাকে। কিন্তু থাইমিনের স্থানে থাকে ইউরাসিল (U)।

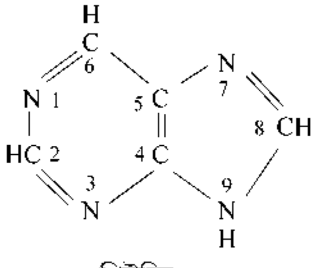

পিউরিন
(Purine)

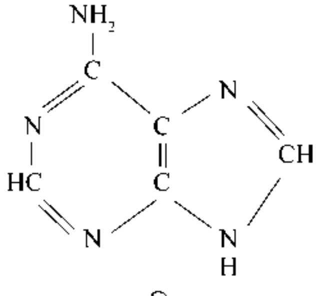

অ্যাডেনিন
(Adenine)

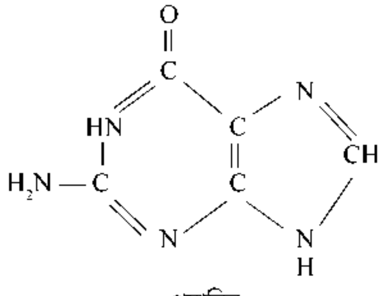

গুয়ানিন
(Guanine)

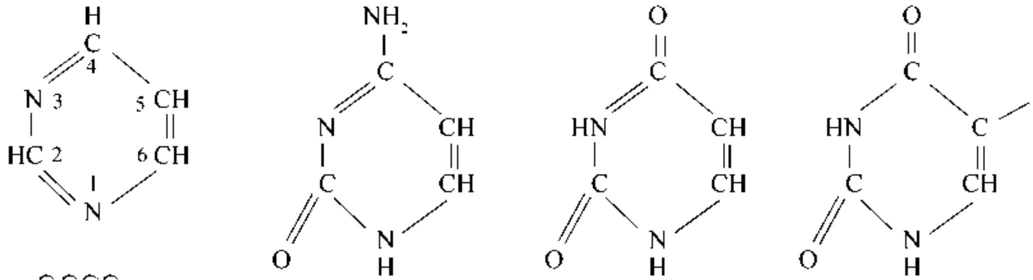

পিরিমিডিন (Pyrimidine) সাইটোসিন (Cytosine) ইউরাসিল (Uracil) থাইমিন (Thymine)

চিত্র 4.1 ঃ DNA এবং RNA-এ তে নাইট্রোজেন ঘটিত বেসের গঠন

একটি নিউক্লিওটাইড, যা দিয়ে বস্তুত DNA এবং RNA গঠিত, আগেই বলা হয়েছে যে তা একটি সুগার, একটি নাইট্রোজেন গঠিত বেস এবং একটি ফসফেট গ্রুপ নিয়ে গঠিত। নাইট্রোজেন গঠিত বেস এবং সুগারকে একত্রে নিউক্লিওসাইড বলা হয়। সুতরাং একটি নিউক্লিওটাইডকে আমরা একটি নিউক্লিওসাইড ফসফেট ও বলতে পারি। DNA-এর চারটি ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড সাবইউনিট হল— ডিঅক্সিঅ্যাডিনোসিন 5'–মোনোফসফেট (dAMP), ডিঅক্সি গুয়ানোসিন 5' মোনোফসফেট (dGMP), ডিঅক্সিসাইটিডিন 5'– মোনোফসফেট (dCMP) এবং ডিঅক্সিথাইমিডিন 5' মোনোফসফেট (dTMP)। RNA-এর চারটি রাইবোনিউক্লিওটাইড সাবইউনিট হল অ্যাডিনোসিন 5'-মোনোফসফেট (AMP), গুয়ানোসিন 5'-মোনোফসফেট (GMP), সাইটিডিন 5' মোনোফসফেট (CMP), এবং ইউরিডিন 5'- মোনোফসফেট (UMP)।

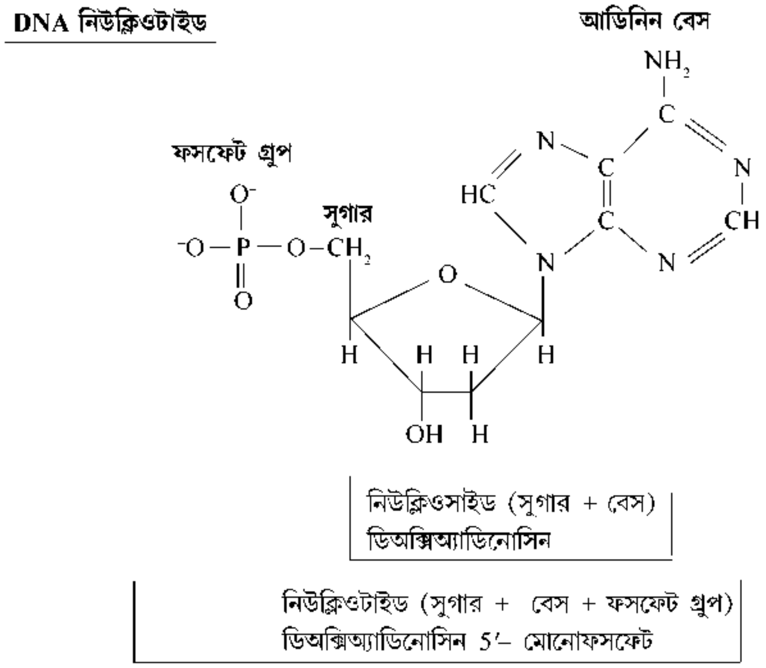

RNA নিউক্লিওটাইড

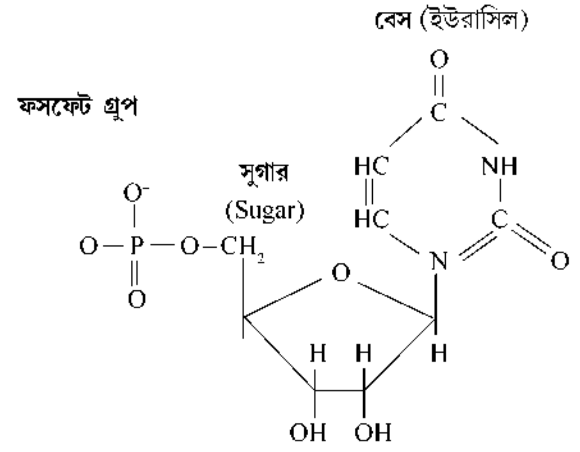

নিউক্লিওসাইড (সুগার + বেস)
ইউরিডিন

নিউক্লিওটাইড (সুগার + বেস + ফসফেট গ্রুপ)
ইউরিডিন 5′– মোনোফসফেট অথবা ইউরিডিলিক অ্যাসিড

চিত্র 4.2 ঃ DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠন

DNA অথবা RNA-এর নিউক্লিওটাইডগুলি সুগার এবং ফসফেট গ্রুপের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের সহিত যু— হয়ে পলিনিউক্লিওটাইড গঠন করে। যে বন্ধনের মাধ্যমে সুগার এবং ফসফেট গ্রুপগুলি একে অন্যের সহিত যু— হয়, তা হল কোভ্যালেন্ট বন্ধন (covalent bond)। প্রকৃতপক্ষে একটি নিউক্লিওটাইডের ফসফেট গ্রুপ অপর একটি নিউক্লিওটাইডের পেন্টোজ সুগারের সহিত যুক্ত হয়ে ফসফোডাইএস্টার বন্ধন গঠন করে।

2.4.2 DNA-এর ভৌত গঠন (Physical Structure) ঃ দ্বিতন্ত্রী নক্সা

১৯৫৩ সালে জেমস ডি. ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস এইচ. সি. ক্রিক (James D. Watson and Francis H.C. Crick) সর্বপ্রথম DNA-এর ভৌত এবং রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে তাঁদের নক্সা (model) প্রকাশ করেন। তাঁদের মডেল অনুসারে প্রায় সমস্ত DNA-ই দুটি পলিনিউক্লিওটাইড চেইন (polynucleotide chain) দিয়ে তৈরী। এই চেইন দুটি ঘোরানো সিঁড়ির মত ডান দিকে প্যাঁচ দেওয়া থাকে এবং এদের প্রত্যেকটির ব্যাস হল 2 nm। এই চেইন দুটি বিপরীত পোলারিটি (antiparallel) দেখায় অর্থাৎ একে অন্যের পরিপূরক। DNA-এর দুটি চেইনের বাইরের দিকে থাকে সুগার এবং ফসফেট। ভিতরের দিকে থাকে নাইট্রোজেন ঘটিত বেস। দুটি বিপরীত দণ্ডের বেসগুলি একে অন্যের সঙ্গে দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে। A অর্থাৎ অ্যাডিনিন সবসময় T অর্থাৎ থাইমিনের সঙ্গে এবং গুয়ানিন (G) সবসময় সাইটোসিনের (C) সঙ্গে মিলিত হতে পারে। A, T-এর সঙ্গে দুটি এবং G, C-এর সঙ্গে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ধনের দ্বারা যুক্ত হয়। এক একটি দণ্ডে দুটি বেস পেয়ার 0·34 nm দূরত্বে থাকে। প্রতিটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড পরস্পর 36^0 কোণ করে অবস্থান করে এবং এক একটি প্যাঁচে ১০টি করে বেস পেয়ার (base pairs) থাকে।

(A) Molecular model (B) Stylized diagram (C) Chemical Structure

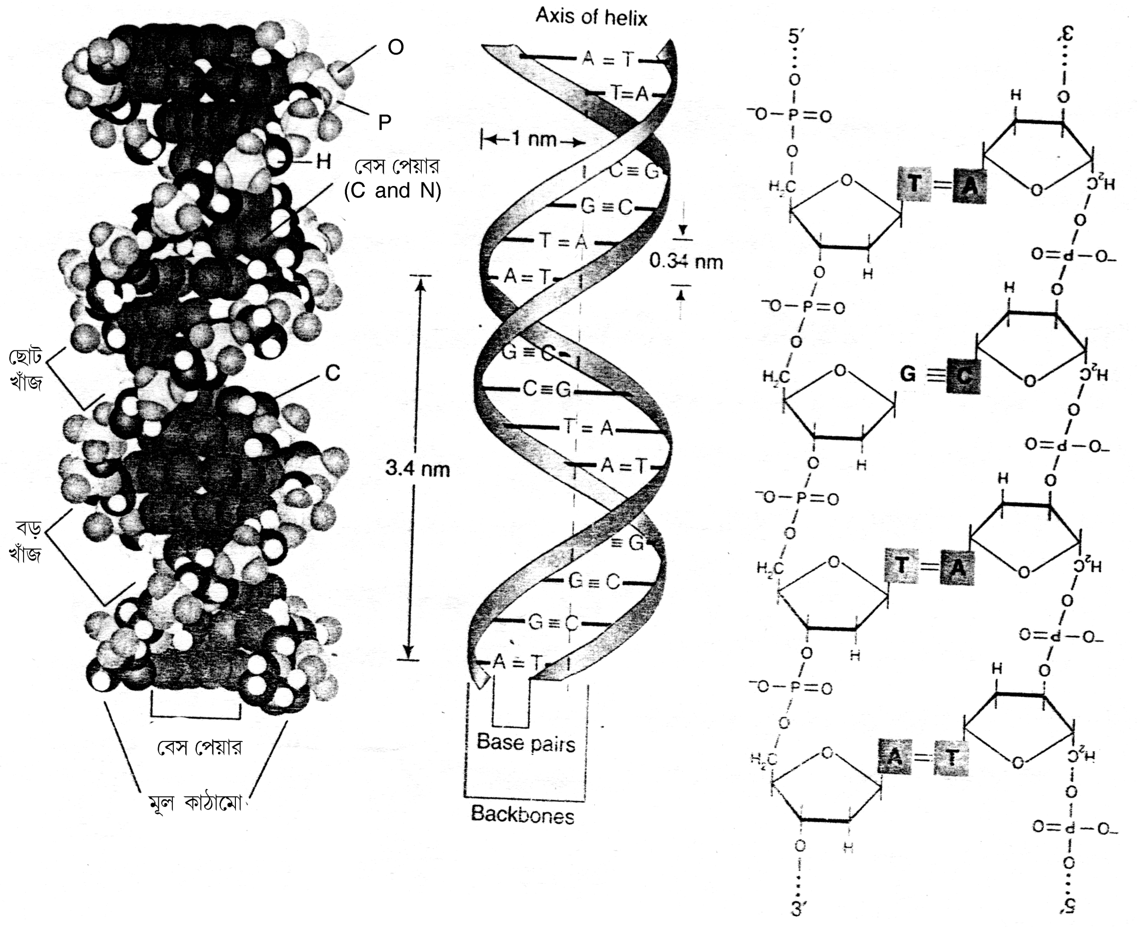

চিত্র 4.3 ঃ DNA-এর আণবিক গঠন ঃ ওয়াটসন ও ক্রিক-এর দ্বি-কুণ্ডলী নক্সা

X-রে ডিফ্রেক্সান (X-ray diffraction) থেকে আমরা DNA-এর ভিন্ন রূপ, যেমন A-রূপ, B-রূপ প্রভৃতি দেখতে পাই। যখন আদ্রতা খুব বেশী থাকে, DNA তখন B-DNA হিসেবে এবং যখন আর্দ্রতা খুব কম থাকে, তখন A-DNA হিসেবে থাকে। এই দুই ধরনের DNA-ই ডান দিকে প্যাঁচ করে থাকে। আর এক ধরনের DNA আমরা দেখতে পাই, তা হল Z-DNA, যা বাম দিকে প্যাঁচ করে থাকে।

2.4.3 DNA-ই বংশগতির ধারক এবং বাহক (DNA-the genetic material)

(ক) **গ্রিফিথের পরীক্ষা** (Experiment by Griffith) ঃ গ্রিফিথ 1928 সালে ডিপ্লোকক্কাস নিউমোনি (*Diplococcus pneumoniae*) নামক নিউমোকক্কাস ব্যাকটিরিয়ার উপর পরীক্ষা চালান। এই ব্যাকটিরিয়ার

কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের উপর 1920 সাল থেকে গবেষণা চলছিল। এই ব্যাকটিরিয়ার দুটি নির্দিষ্ট টাইপ (type) ছিল। S - টাইপ এবং R - টাইপ। S - টাইপের ব্যাকটিরিয়ার পলিস্যাকারাইডের ক্যাপসুলে আবৃত কোষ প্রাকার থাকে। এর ফলে এদের কলোনী মসৃণ এবং চকচকে দেখায় এবং এরা মারাত্মক ক্ষতিকারক (Virulent) হয়। R-টাইপের ব্যাকটিরিয়ার ক্যাপসুল থাকে না এবং এর ফলে এদের দেহ অমসৃণ বা Rough হয় এবং এরা কম ক্ষতিকারক বা ক্ষতিকারক নয় (avirulent)।

চিত্র 4.4 ঃ ব্যাকটিরিয়া ডিপ্লোকক্কাস নিউমনির ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ

S type কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়, II S এবং III S-এ। S টাইপ আবার পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের মাধ্যমে R টাইপে পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু R টাইপ সহজে S টাইপ-এ পরিবর্তিত হতে পারে না। S টাইপ যখন R টাইপে পরিবর্তিত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে যদি ঐটি II S থাকে, তখন সেটি R টাইপে পরিবর্তিত হয়ে II S-ই থাকবে, III S হবে না।

1928 সালে গ্রিফিথ, টাইপ II S থেকে পরিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত R টাইপ ব্যাকটিরিয়া একটি ইঁদুরে ইনজেকশনের দ্বারা প্রবিষ্ট করান। এই R টাইপ ব্যাকটিরিয়া ইঁদুরটির কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ইঁদুরটির রক্তে এই ব্যাকটিরিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়। এরপর গ্রিফিথ জীবন্ত III S - টাইপ ইঁদুরে প্রবিষ্ট করান এবং এর ফলে ইঁদুরগুলি মরে যায়। যদি টাইপ III S ব্যাকটিরিয়াকে তাপ দিয়ে মেরে ফেলে, তার পর ইঁদুরগুলিতে ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবিষ্ট করান হয়; তাহলে ইঁদুরগুলি জীবিত থাকে। এই পরীক্ষাগুলি থেকে এটা প্রমাণ হয় যে একমাত্র সেই ব্যাকটিরিয়াগুলিই সংক্রমণ ঘটাতে পারে, যাদের পলিস্যাকারাইড আবৃত কোষ প্রাকার থাকে।

সবশেষে, গ্রিফিথ জীবন্ত R ব্যাকটিরিয়া (যা টাইপ II S থেকে পরিবর্তিত) এবং তাপ প্রদানে মৃত টাইপ III S ব্যাকটিরিয়ার একটি মিশ্রণ তৈরী করেন এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে ইঁদুরে প্রবিষ্ট করান। এই ক্ষেত্রে ইঁদুরগুলি মারা যায় এবং এদের রক্তে জীবন্ত S - ব্যাকটিরিয়া দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি সবই ছিল III S টাইপের। এই ব্যাকটিরিয়াগুলি R ব্যাকটিরিয়া থেকে পরিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় নি। গ্রিফিথ মন্তব্য করেন যে কিছু R ব্যাকটিরিয়া কোন প্রকারে মসৃণ, সংক্রমক III S টাইপে পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে মৃত III S টাইপের সঙ্গে সংযোগের মাধ্যমে। এই পরিবর্তিত III S টাইপগুলি তাদের সংক্রমণ ধর্ম

বজায় রাখে এবং এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই পরিবর্তন বা ট্রান্সফরমেশন (transformation) হল স্থায়ী। গ্রিফিথ ভেবেছিলেন, যে কোনো অজানা জিনিস (প্রোটিন) এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী এবং তিনি এটিকে বলেছিলেন ট্রানসফরমিং প্রিন্সিপল (transforming principle) বা স্থানান্তরিত বস্তু।

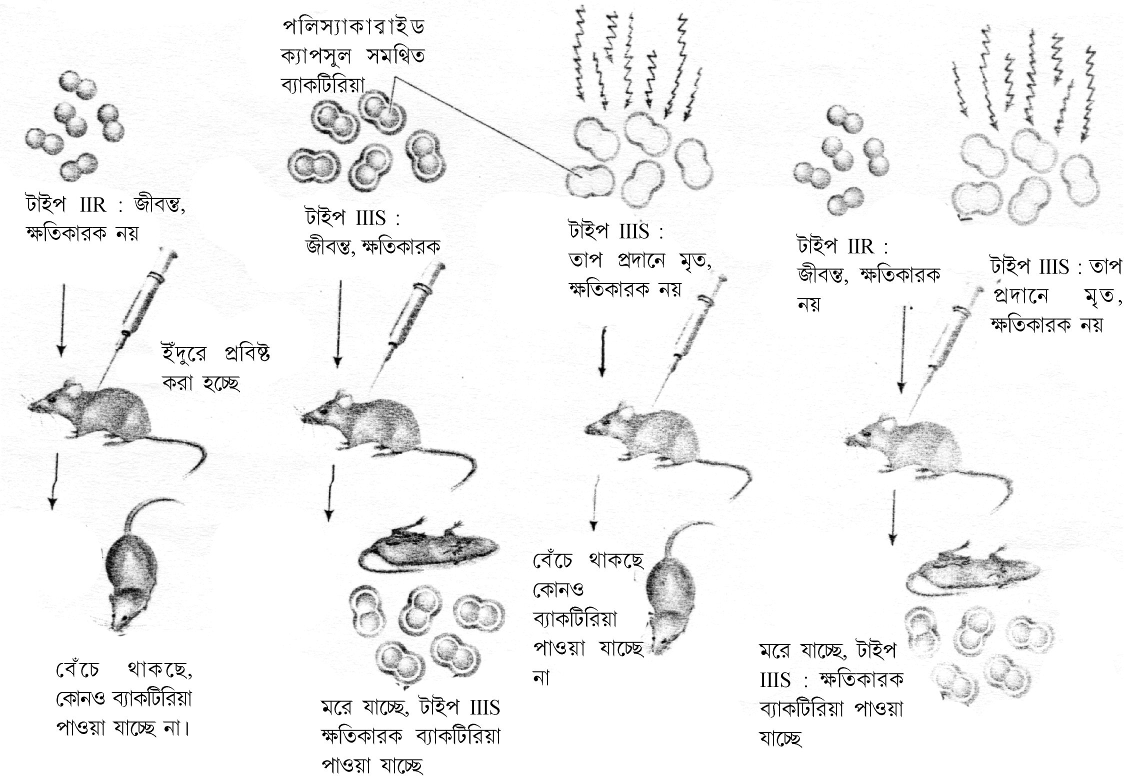

চিত্র 4.5 ঃ গ্রিফিথের পরীক্ষা ঃ

ইঁদুরটিকে টাইপ III S নিউমোকক্কাস ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ইনজেক্ট করলে ইঁদুরটি মারা যায়। অপরপক্ষে ইঁদুরকে টাইপ II R অথবা তাপ প্রদানে মৃত টাইপ III S ব্যাকটিরিয়া দ্বারা ইনজেক্ট করলে ইঁদুরগুলি বেঁচে থাকে। যখন ইঁদুরগুলিকে জীবন্ত টাইপ II R ব্যাকটিরিয়া ও তাপ প্রদানে মৃত টাইপ III S ব্যাকটিরিয়ার মিশ্রণ দ্বারা ইনজেক্ট করা হয়, ইঁদুরগুলি মারা যায়।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে তাপ প্রবাহের মাধ্যমে ভিরুলেন্ট ব্যাকটিরিয়ার বংশগতির কিছু বস্তু নষ্ট হয়নি এবং এইগুলি জীবন্ত অক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ায় রিকম্বিনেশনের (recombination) মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং পরিবর্তিত ক্ষতিকারক ব্যাকটিরিয়ায় পরিবর্তিত হয়।

(খ) **আভেরী, ম্যাকলিওড ও ম্যাক্কার্টির পরীক্ষা** (Experiment by Oswald T. Avery, Colin. M. MacLeod and Maclyn McCarty) ঃ 1944 খ্রিস্টাব্দে আভেরী, ম্যাকলিওড ও ম্যাককার্টি দেখান যে DNAই হল বংশগতির বাহক। তারা টেস্টটিউবে R টাইপ থেকে S টাইপের পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং গ্রিফিথের

পরীক্ষার স্থানান্তরিত বস্তুটি যে DNA ছাড়া কিছুই নয় সেটি প্রমাণ করেন। তাঁদের পরীক্ষায় তাঁরা টাইপ (type) III S ব্যাকটিরিয়ার কোষ থেকে লিপিড, পলিস্যাকারাইড, প্রোটিন এবং নিউক্লিক অ্যাসিড DNA এবং RNA নিষ্কাশিত করেন এবং পরীক্ষা করে দেখান যে, এদের মধ্যে কোনটি হল সেই পরিবর্তিত বস্তু যেটা II S টাইপ থেকে জীবন্ত R টাইপ ব্যাকটিরিয়া হতে সাহায্য করে। তাঁরা এটা প্রমাণ করেন যে নিউক্লিক অ্যাসিডই হল সেই পরিবর্তিত বস্তু যেটি টাইপ III S-এ ছিল এবং যেটি R টাইপ থেকে III S টাইপে পরিবর্তিত হতে সাহায্য করে।

অ্যাভেরী এবং তাঁর বন্ধুরা তারপর নির্দিষ্ট উৎসেচক নিউক্লিয়েজ ব্যবহার করেন যেটি নিউক্লিক অ্যাসিডকে ভেঙ্গে দেয়। তাঁরা এটি এই জন্যই ব্যবহার করেন যে তাঁরা তখনও জানতেন না যে DNA অথবা RNA কোনটি সেই পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত বস্তু ছিল। তাঁরা প্রথমে নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে রাইবোনিউক্লিয়েজ (RNase) মেশান, যেটি RNA-কে ভেঙ্গে দেয় কিন্তু DNA ঠিক থাকে। তখন তাঁরা দেখেন যে ব্যাকটিরিয়ার পরিবর্তন সক্রিয় রয়েছে। তারপর তাঁরা যখন ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিয়েজ (DNase) উৎসেচক ব্যবহার করেন; যেটা DNA-কে ভেঙ্গে দেয়, তখন তারা দেখেন যে ব্যাকটিরিয়ার পরিবর্তন (transformation) হচ্ছে না। সুতরাং এই পরীক্ষা থেকে তাঁরা প্রমাণ করেন যে **DNAই হল সেই পরিবর্তিত বস্তু**। যদিও অ্যাভেরীদের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু তাঁদের কাজের অনেক সমালোচকও ছিলেন। কারণ ব্যাকটিরিয়া থেকে যে নিউক্লিক অ্যাসিড নিষ্কাশিত করা হয়েছিল, সেটা পুরোপুরি শুদ্ধ ছিল না, কিছু প্রোটিন, নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে মিশ্রিত ছিল।

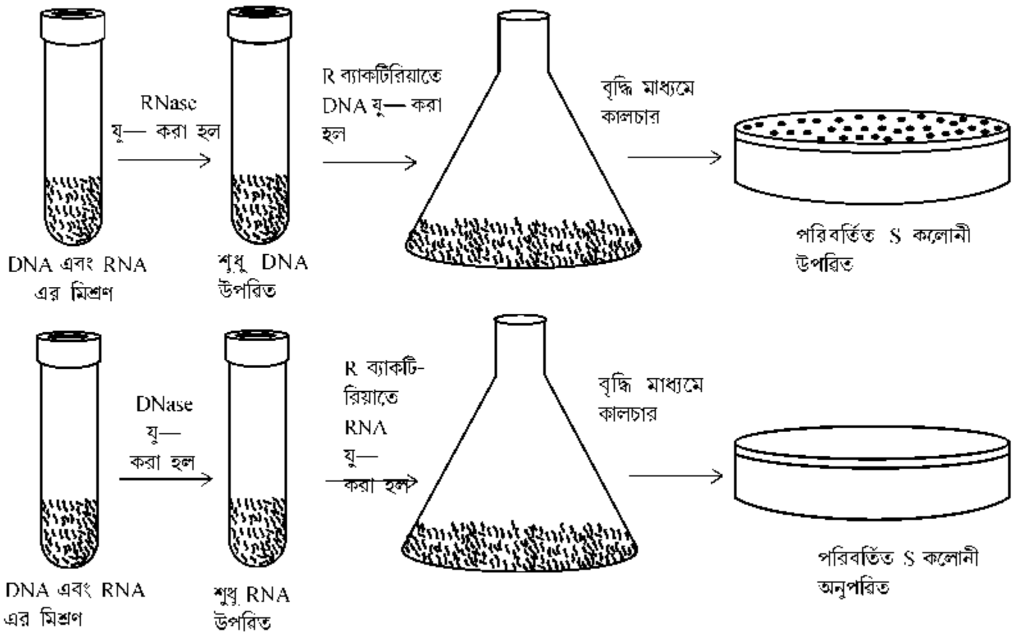

চিত্র 4.6 ঃ উপরের পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে RNA নয়, DNA-ই হল পরিবর্তিত বস্তু।

(গ) **হার্সে এবং চেজের পরীক্ষা** (Experiments by Alfred D. Hershey and Martha Chase) ঃ 1953 সালে হার্সে এবং চেজ আবার পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে DNA-ই হল বংশগতির বাহক। তারা ব্যাকটিরিওফাজ T2 (Bacteriophage T2) -কে তাদের কাজের জন্য বেছে নেন। এই ফাজ এসচেরিচিয়া কোলি (*Escherichia coli*) নামক ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে এবং এদের মাধ্যমেই বংশ বিস্তার করে।

হার্সে এবং চেজ, ই. কোলি ব্যাকটিরিয়াকে একটি কালচার মিডিয়ামে বর্ধিত করেন যার মধ্যে তাঁরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ, যথাক্রমে P^{32} এবং S^{35} প্রয়োগ করেন। P^{32} হল ফসফরাসের এবং S^{35} হল সালফারের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। তাঁরা এই আইসোটোপগুলি একটি নির্দিষ্ট কারণে ব্যবহার করেন। কারণ DNA-এতে ফসফরাস এবং প্রোটিনে সালফার থাকে। তারা এই ব্যাকটিরিয়াগুলিকে T2 ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান এবং এর থেকে যে ফাজগুলি বংশবিস্তারের মাধ্যমে তৈরী হয়, তাদের সংগ্রহ করেন। এর থেকে তাঁরা দু ধরনের ফাজ পান। কিছু ফাজের প্রোটিনে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ S^{35} ছিল এবং কিছু ফাজের DNA-এতে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ P^{32}

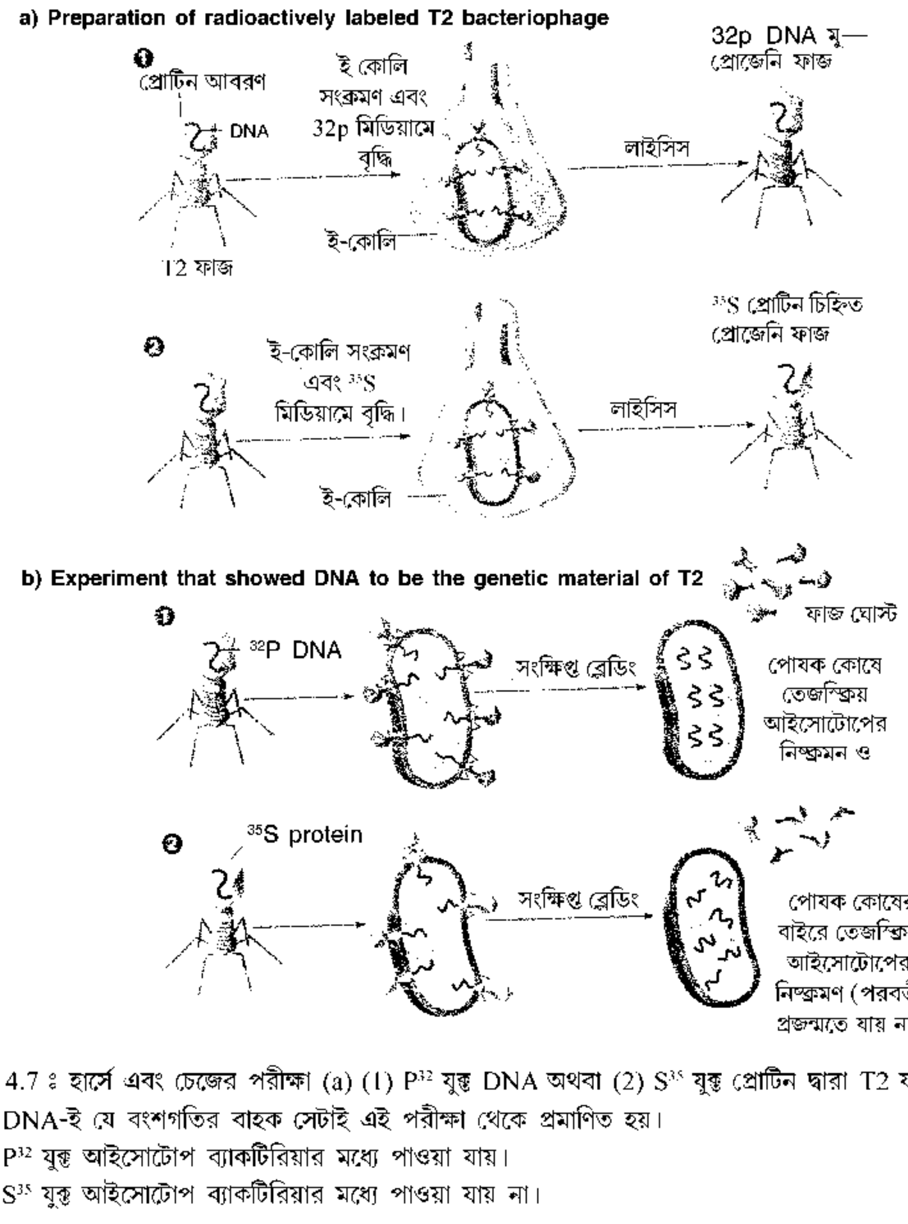

চিত্র 4.7 ঃ হার্সে এবং চেজের পরীক্ষা (a) (1) P^{32} যুক্ত DNA অথবা (2) S^{35} যুক্ত প্রোটিন দ্বারা T2 ফাজ তৈরী করা। (b) DNA-ই যে বংশগতির বাহক সেটাই এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়।

(1) P^{32} যুক্ত আইসোটোপ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

(2) S^{35} যুক্ত আইসোটোপ ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না।

ছিল। যেহেতু তাঁরা জানতেন যে T2 ফাজের দেহ DNA এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত, সুতরাং এদের মধ্যে কোন একটি অর্থাৎ হয় DNA নয় প্রোটিন হল জেনেটিক বস্তু।

এর পর তাঁরা কিছু ই. কোলি ব্যাকটিরিয়াকে এই দুই ধরনের ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান। তাঁরা লক্ষ্য করেন যে, যখন তারা P^{32} তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ যুক্ত ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান, সংক্রমণের কিছুক্ষণ পরেই ঐ তেজষ্ক্রিয়তা ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর কিচেন ব্লেন্ডার (Kitchen blender) দিয়ে পোষক দেহের বাইরে লেগে থাকা ফাজের দেহাবরণী ছাড়িয়ে, পোষকদেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে ফেলা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে P^{32} তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ ছিল না। অপরপক্ষে, যখন তাঁরা কিছু ই. কোলি ব্যাকটিরিয়াকে S^{35} তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপ যুক্ত ফাজ দ্বারা সংক্রমণ করান, ব্যাকটিরিয়ার দেহে কোন তেজষ্ক্রিয়তাই লক্ষ্য করা যায় না। বেশীর ভাগ তেজষ্ৰিয় আইসোটোপই পোষকদেহের বাইরে লেগে থাকা ফাজের দেহাবরণীতেই খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং এই পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে ফাজ-এর প্রোটিন আবরণীতে S^{35} চিহ্নিত রয়েছে এবং ব্যকটিরিয়ার দেহে P^{32} যুক্ত হয়েছে। এই ব্যাকটিরিয়ার দেহ বিদীর্ণ করে যে সব ফাজ সৃষ্টি হয়, তাদের DNA-তেও P^{32} থাকে।

এই পরীক্ষা থেকে এটাও স্পষ্ট যে ভাইরাসের DNA বস্তু পোষক দেহে প্রবেশ করে কিন্তু সকল প্রোটিন বস্তু পোষক দেহের বাইরে থেকে যায়। সুতরাং প্রোটিন বস্তু বংশগতির বাহক হতে পারে না। কেবলমাত্র ভাইরাসের DNA-ই ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে প্রবেশ করে। পোষক কোষের মধ্যে ভাইরাসটির যখন বংশোৎপাদন ঘটতে থাকে তখন তার দেহটি কেবল DNA দ্বারা তৈরী থাকে। পরে প্রতিটি DNA এককের চারপাশে প্রোটিন আবরণী তৈরী হয়। ফলে পূনরায় অনেক সংক্রমণকারী P^{32} চিহ্নিত DNA যুক্ত ফাজের সৃষ্টি হয়। সুতরাং DNA-ই হল বংশগতির বাহক।

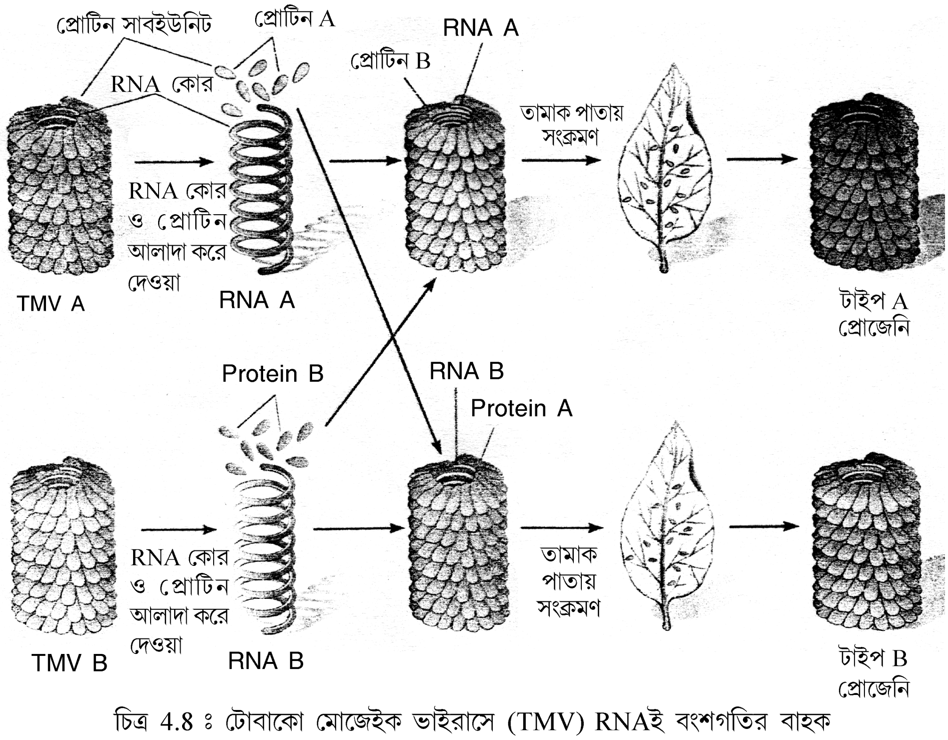

চিত্র 4.8 ঃ টোবাকো মোজেইক ভাইরাসে (TMV) RNAই বংশগতির বাহক

RNA বংশগতির বাহক ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যা আলোচনা করেছি, তাতে বলা হয়েছে DNA হল বংশগতির বাহক। কিন্তু কিছু ব্যাকটিরিয়াল ভাইরাস (উদাঃ QB), কিছু প্রাণীর ভাইরাস (উদাঃ পোলিও ভাইরাস) এবং কিছু গাছের ভাইরাস (উদাঃ টোবাকো মোজেক ভাইরাস) আছে, যাদের বংশগতির বাহক হল RNA।

নিম্নলিখিত পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে টোবাকো মোজেক ভাইরাসে RNA-ই হল বংশগতির বাহক। এই ভাইরাস তামাক গাছের পাতায় ক্ষতের সৃষ্টি করে।

T2 ফাজের মত TMV ভাইরাসও RNA এবং প্রোটিন নিয়ে গঠিত। RNA কোরের চারিদিকে প্রোটিন ঘেরা থাকে এবং এই প্রোটিন RNA-কে নিউক্লিয়েজ উৎসেচক থেকে রক্ষা করে।

1956 সালে জিরার এবং সারাম (A. Gierer and G. Schramm) পরীক্ষা করে দেখান যে TMV ভাইরাসের RNA (প্রোটিন কোট ছাড়া) দ্বারা কোনো তামাক গাছকে সংক্রমণ করা হলে তারা তামাক গাছের যে ক্ষতি করে তা দেখতে পুরোপুরি ভাইরাস আক্রমণ করলে যেমন হয়, ঠিক সেইরূপ। কিন্তু যদি নিউক্লিয়েজ উৎসেচক দ্বারা RNA-কে ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং তার পরে যদি সেটি কোনোও তামাক গাছকে সংক্রমণ করে তাহলে তামাক গাছের কোনও ক্ষতি হয় না। এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে TMV ভাইরাসে RNA-ই হল বংশগতির বাহক।

1957 সালে কনরাট এবং সিঙ্গার (Cornat and Singer) পুনরায় প্রমাণ করেন যে RNA-ই হল বংশগতির বাহক। তাঁরা দুটি ভিন্ন TMV স্ট্রেন (strain) নেন এবং একটির থেকে RNA এবং অন্যটির থেকে প্রোটিন আলাদা করেন এবং একটির প্রোটিন থেকে RNA এবং অন্যটির RNA থেকে প্রোটিন তৈরী করেন। তাঁরা তারপর তামাক পাতাকে এই দুই ধরনের সংকর ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমণ করান। সংক্রমণের পরে যে ভাইরাসগুলি ক্ষত থেকে আলাদা করা হয় তাদের টাইপ RNA-এর মতই হয়, প্রোটিনের মত নয়। এই ফলাফল থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে TMV (Tobaco Mosaic Virus) ভাইরাসে RNA-ই হল বংশগতির বাহক।

টোবাকো মোজেইক ভাইরাস একটি RNA কোর এবং তার চারিদিকের প্রোটিন নিয়ে তৈরী। একটি ভাইরাসের স্ট্রেন থেকে প্রোটিন এবং অন্য একটি স্ট্রেন থেকে RNA নিয়ে একটি শংকর ভাইরাস তৈরী করা হয়। এই ভাইরাস দ্বারা টোবাকো পাতার সংৰমণ করা হয় এবং সংক্রমণের পরে যে ভাইরাসগুলি ক্ষতস্থান থেকে পাওয়া যায় তাদের টাইপ RNA-র মতই হয়; প্রোটিনের মত নয়। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রোটিন নয়, RNA-ই বংশগতির বাহক।

বংশগতির বাহকের কিছু ধর্ম ঃ

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, DNA এবং কিছু ক্ষেত্রে RNA উভয়েই বংশগতির বাহক হতে পারে। এদের প্রধান ধর্মগুলি হল —

- নির্ভুল প্রতিলিপি গঠন (replication) করার ক্ষমতা,
- পৃথকীভবন এবং পুনর্মিলন হবার ক্ষমতা,
- সঙ্করায়ন হবার ক্ষমতা,
- মিউটেশন, সংশ্লেষণ ও মেরামত করার ক্ষমতা ইত্যাদি।

2.4.4 DNA রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন ও প্রোটিন সংশ্লেষ

DNA নির্ভুল প্রতিলিপি গঠন করতে পারে। যে পদ্ধতির দ্বারা এটা সম্ভব, তাকে বলে DNA-এর **রেপ্লিকেশন** (replication)। রেপ্লিকেশন সর্বদা সেমিকনজারভেটিভ (semiconservative) পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আমরা

আগেই বলেছি যে, DNA দুটি পলিনিউক্লিওটাইড চেইন দিয়ে তৈরী। রেপ্লিকেশনের সময় এই চেইন দুটি পরস্পরের থেকে প্রথমে আলাদা হয়ে যায়। হেলিকেজ প্রোটিন এই কাজে প্রধান ভূমিকা পালন করে। S. S. B (Single Strand Binding Protein) প্রোটিনও উপরোক্ত চেইন দুটিকে আলাদা রাখতে সাহায্য করে, কারণ সেটা ছাড়া DNA-এর প্রতিলিপি গঠন করা সম্ভব নয়। এর পর প্রাইমেজ উৎসেচক হেলিকেজের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি ছোট RNA প্রাইমার তৈরী করে। এই প্রাইমার চার প্রকার dNTP-র এবং Mg^{+2} সাহায্যে DNA পলিমারেজ (Polymerase)-III উৎসেচকের দ্বারা DNA পলিমেরাইজেশনে (Polymerization) সাহায্য করে। এর ফলে, পূর্বের আলাদা হওয়া প্রতিটি চেইন থেকে একটি করে নতুন DNA তৈরী হয়। অর্থাৎ পূর্বের প্রতিটি DNA চেইন একটি করে নতুন প্রতিলিপি গঠন করে। DNA লাইগেজ এবং DNA পলিমারেজ-I উপরোক্ত এই ঘটনাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে জনিতৃ বা মূল DNA অণু বিভক্ত হয় এবং দুটি অপত্য DNA অণু তৈরী হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক DNA অণুর অর্ধেক (একটি দণ্ড) থাকে, জনিতৃ DNA এককতন্ত্রী এবং অপর অর্ধেক থাকে নতুন সংশ্লেষিত DNA এককতন্ত্রী।

যে পদ্ধতির মাধ্যমে DNA থেকে RNA তৈরী হয়, ছোট অংশে পরস্পর পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে

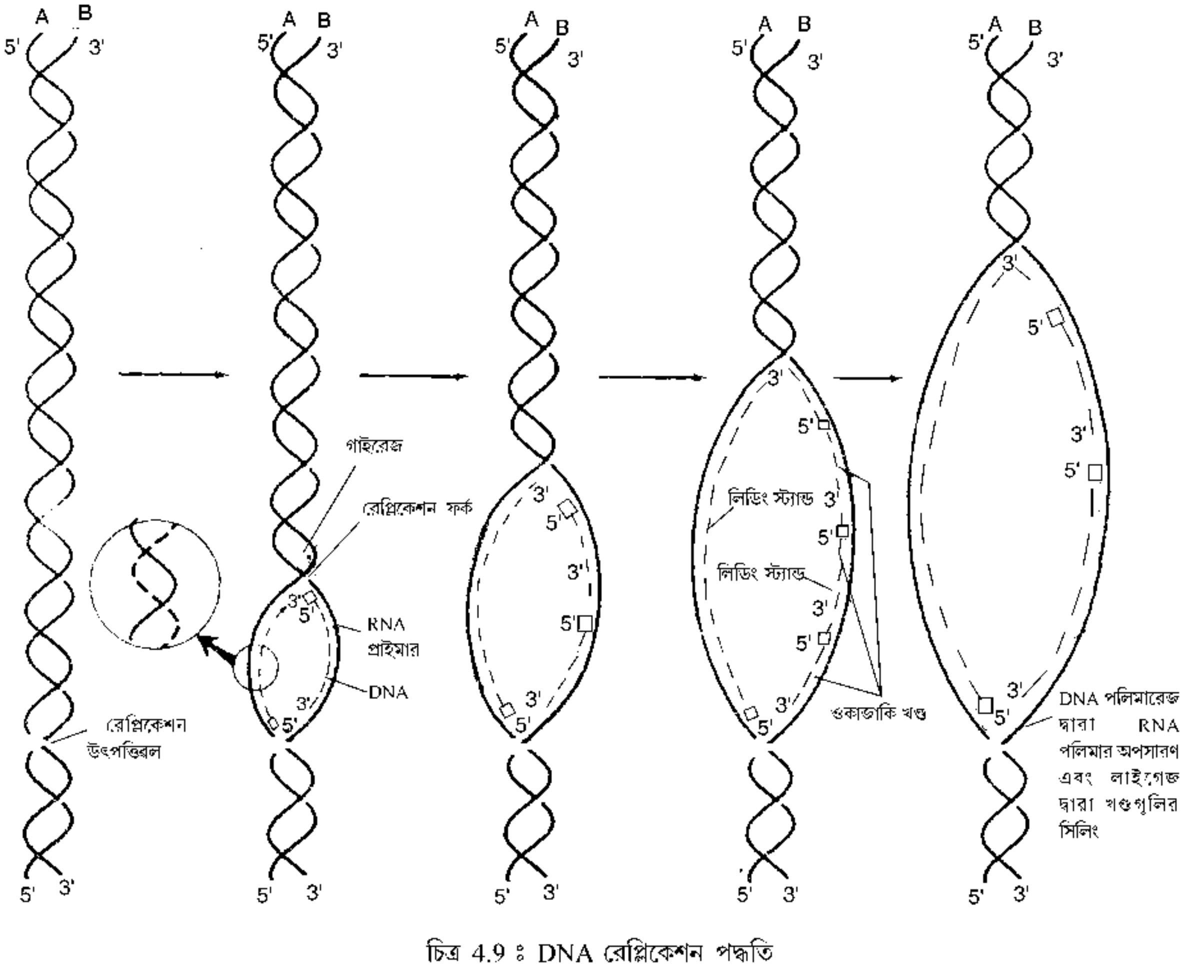

চিত্র 4.9 ঃ DNA রেপ্লিকেশন পদ্ধতি

%ব

যায়, RNA পলিমারেজ উৎসেচক সেই DNA থেকে নতুন RNA তৈরী করে। 3' – 5' DNA থেকে 5' _ 3' RNA তৈরী হয়। DNA-এর দুটি চেইনের মধ্যে কেবলমাত্র একটি চেইন থেকেই RNA তৈরী হয়।

প্রোক্যারিওটে (যেমন *ই. কোলি*) একটি নির্দিষ্ট RNA পলিমারেজ উৎসেচকই mRNA, tRNA এবং rRNA তৈরী করতে পারে। কিন্তু ইউক্যারিওটে তিনটি নির্দিষ্ট RNA পলিমারেজ উৎসেচক এই কাজ করে। RNA পলিমারেজ-I 28S, 18S এবং 5·8S রাইবোজোমাল RNA, RNA পলিমারেজ-II mRNA এবং RNA পলিমারেজ-III 5S RNA, tRNA এবং কিছু snRNA তৈরী করতে পারে।

ট্রান্সৰিপশনের জন্য প্রোমোটার এবং টার্মিনেটর জায়গা দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। RNA পলিমারেজ প্রথম প্রোমোটারের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং এর পরে RNA তৈরী শুরু হয়। অন্যদিকে টার্মিনেটর (terminator) ৰানে এসেই RNA তৈরী বন্ধ হয়ে যায় এবং RNA পলিমারেজ তার কাজ বন্ধ করে দেয়।

প্রোক্যারিওটে DNA থেকে mRNA তৈরী হওয়ার পর সেই mRNA-এর আর কোনও পরিবর্তন হয় না।

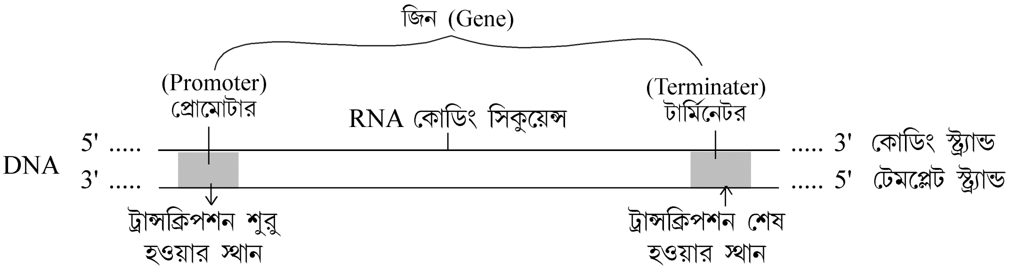

কিন্তু ইউক্যারিওটে mRNA তৈরী হওয়ার পর তার কিছু কিছু পরিবর্তন হয়।

(1) 5'-এ একটি মিথাইলেটেড ক্যাপ (methylated cap) যুক্ত হয়।

(2) 3'-এ একটি পলি (A) টেইল (tail) যুক্ত হয়।

(3) Pre mRNA থেকে ইন্ট্রনগুলি (intron যেগুলি থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী হয় না) আলাদা হয়ে যায় এবং এক্সন (Exon - যেগুলি থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী হয়) গুলি পরস্পর যুক্ত হয়।

Pre mRNA থেকে mRNA হতে গেলে উপরোক্ত এই তিনটি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

RNA থেকে প্রোটিন তৈরী হওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় **ট্রান্সলেশন**। আমরা জানি, প্রোটিন পলিপেপটাইড

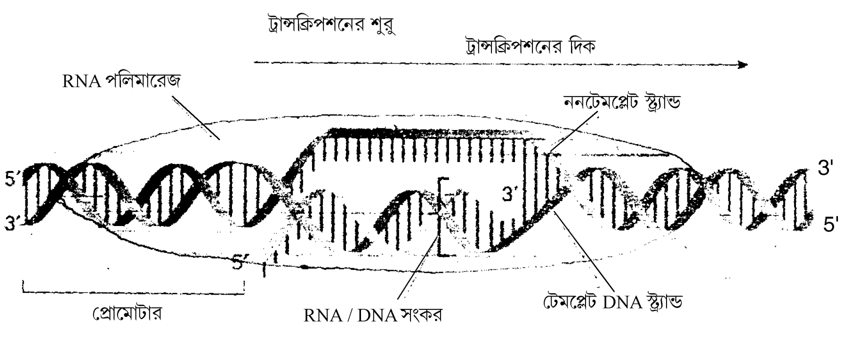

চিত্র 4.10 ঃ ট্রান্সক্রিপশন

দিয়ে তৈরী। অনেকগুলি অ্যামাইনো অ্যাসিড পেপটাইড বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে একটি পলিপেপটাইড চেইন তৈরী করে। mRNA-এর তিনটি নিউক্লিওটাইডের একটি সেট, যাকে কোডনও বলা হয়; সেটি পলিপেপটাইড চেইনে একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী করে। ফ্র্যান্সিস ক্রিক (Francis Crick) 1960-এ প্রথম **জেনেটিক কোড** আবিষ্কার করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী হরগোবিন্দ খোরানা, প্রথম দেখান যে মোট 64টি কোডনের জন্য 20টি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। অনেক সময় একের বেশি কোডনের দ্বারা একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্ধারিত হতে পারে। বিশ্বের সর্বত্র এই কোডনগুলি একই ভাবে ব্যবহৃত হয়। AUG কোডন, যেটি মিথিওনিন নামক অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্ধারণ করে, সেটিই প্রোটিন তৈরী হওয়া শুরু করে এবং প্রোটিন তৈরী হওয়া বন্ধ হয় UAG (amber) UAA (ochre) এবং UGA (opal) এই তিনটির কোনও একটি কোডন দ্বারা। এই কোডন তিনটিকে টার্মিনেশন কোডন বলা হয়।

রাইবোজোমে ট্রান্সলেশন অর্থাৎ প্রোটিন সংশ্লেষ হয়। যে RNA, কোষের অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাণ্ডার থেকে

Second letter

First letter	U	C	A	G	Third letter
U	UUU	UCU	UAU	UGU	U
	UUC^{Phe}	UCC	UAC^{Tyr}	UGC^{Cys}	C
	UUA	UCA^{Ser}	UAA^{Stop}	UGA^{Stop}	A
	UUG^{Leu}	UCG	UAG^{Stop}	UGG	G
C	CUU	CCU	CAU	CGU	U
	CUC	CCC	CAC^{His}	CGC	C
	CUA^{Leu}	CCA^{Pro}	CAA	CGA^{Arg}	A
	CUG	CCG	CAG^{Gln}	CGG	G
A	AUU	ACU	AAU	AGU	U
	AUC^{Ile}	ACC	AAC^{Asn}	AGC^{Ser}	C
	AUA	AC^{Thr}	AAA	AGA	A
	AUG^{Met}	ACG	AAG^{Lys}	AGG^{Arg}	G
G	GUU	GCU	GAU	GGU	U
	GUC	GCC	CAC^{Asp}	GGC	C
	GUA^{Val}	GCA^{Ala}	GAA	GGA^{Gly}	A
	GUG	GCG	GAG^{Glu}	GGG	G

চিত্র 4.11 ঃ জেনেটিক ট্রিপ্লেট কোড এবং উহার দ্বারা নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিড

প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে mRNA কর্তৃক নির্দেশিত কোডন বুঝে সঠিক অ্যামাইনো অ্যাসিড পরিবহণ করে, তাকে পরিবাহক বা ট্রান্সফার RNA (tRNA) বলে। tRNA-এর একটি প্রান্তে তিনটি অযুগ্ম বেস থাকে, এই তিনটি অযুগ্ম বেসকে অ্যান্টিকোডন (anticodon) বলে। এই অঞ্চলই mRNA-র পরিপূরক বেসগুলি বুঝতে পারে।

AUG কোডন (মিথিওনিন) প্রোক্যারিওট এবং ইউক্যারিওটে প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু করে। সাধারণত প্রোটিন সংশ্লেষের আগে রাইবোজোমগুলি বিচ্ছিন্ন ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। 30 S রাইবোজোম উপএককের সহিত IF3 প্রোটিন ফ্যাক্টরের উপস্থিতিতে mRNA সংযুক্ত হয়। শীঘ্রই সাইটোপ্লাজম থেকে ফরমিল-মিথিওনিন-tRNA (formyl methionine) এসে mRNA-র প্রথম ত্রয়ী সংকেত AUG-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রারম্ভিক যৌগ (Initiation complex) তৈরী করে প্রোটিন সংশ্লেষ শুরু হয়।

এর পর 30S রাইবোজোম উপএকক 50S উপএককের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 70S রাইবোজোম গঠন করে। M^{+2} এই ঘটনায় সাহায্য করে। অ্যামাইনো অ্যাসিড ভাণ্ডার থেকে tRNA অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলিকে পরিবহণ করে প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে নিয়ে যায়। সাইটোপ্লাজমে 20 রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। প্রথমে প্রত্যেকটি অ্যামাইনো অ্যাসিড নির্দিষ্ট উৎসেচক অ্যামাইনো-অ্যাসাইল-সিনথেটেজ ও ATP দ্বারা সক্রিয় হয়। মুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিড ATP-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডেনিলেট তৈরী করে।

			অ্যামাইনো অ্যাসাইল			
AA	+	ATP	——————®	AA~AMP	+	PP
অ্যামাইনো অ্যাসিড			সিনথেটেজ Mg^{+2}	অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডিনাইলেট		পাইরোফসফেট

অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডিনাইলেট উৎসেচকের সঙ্গে মনোকোভ্যালেন্ট কমপ্লেক্স হিসেবে যুক্ত থাকে। অ্যামাইনো অ্যাসাইল অ্যাডিনাইলেট যতক্ষণ না নির্দিষ্ট tRNA-র সংস্পর্শে আসে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসেচকের সঙ্গে যুক্ত থাকে। tRNA-র সংস্পর্শে আসার পর অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA তৈরী হয়।

AA–AMP উৎসেচক + tRNA ® AA–tRNA + AMP + উৎসেচক

অ্যামাইনো
অ্যাসাইল
tRNA

এই অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNA প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে এগিয়ে যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে mRNA-এর প্রথম কোডনটি AUG এবং এটি মিথিওনিন সৃষ্টি করে। এটি ফরমিলেটেড অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকটি প্রোটিনের প্রথমেই মিথিওনিন থাকে, কিন্তু প্রোটিন সংশ্লেষ শেষ হলে উৎসেচকের সাহায্যে ফলমাইল-মিথিওনিন আলাদা হয়ে যায়। tRNA গুলি বিভিন্ন প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড বহন করে প্রোটিন সংশ্লেষের স্থানে আসে এবং রাইবোজোমে প্রবেশ করে।

রাইবোজোমের দুটি সাইট আছে, A এবং P সাইট (Site)। প্রথমে fMet – tRNA রাইবোজোমের P সাইটে এসে বসে। এর পর EF – Tu এবং GTP-র সাহায্যে পরের অ্যামাইনো অ্যাসাইল tRNAটি অন্য একটি অ্যামাইনো অ্যাসিডকে বহন করে A সাইটটি পূরণ করে। এরপর পেপটাইডাল ট্রান্সফারেজ নামক উৎসেচকের সাহায্যে পর পর দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে পেপটাইড বন্ধন গঠিত হয় এবং যুক্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি A সাইটের t-RNA-র সঙ্গে যুক্ত হয়। এই tRNA টি হল একটি নতুন পেপটাইডাল tRNA। এর পর mRNA-তে রাইবোজোম 5′ থেকে 3′-এর দিকে সঞ্চালিত হয়। EF-G এবং GTP এতে সাহায্য করে। এর ফলে পেপটাইডাল tRNAটি P সাইটে সরে যায় এবং অন্য tRNAটি রাইবোজোম ত্যাগ করে। উপরোক্ত এই ঘটনায় A সাইটটি মুক্ত হয়ে যায় এবং অপর একটি অ্যামাইনো অ্যাসিড বহনকারী tRNA ঐ স্থান দখল করে। এই ঘটনা ততক্ষণ ঘটতে থাকে যতক্ষণ না UAG, UAA অথবা UGA এই তিনটি কোডনের কোনও একটি কোডন

রাইবোজোমের A সাইটে mRNA বরাবর এসে পৌঁছায়। এর পরেই রাইবোজোম থেকে পলিপেপটাইডটি এবং tRNA মুক্ত হয়। রাইবোজোমটিও mRNA থেকে মুক্ত হয় এবং এই ভাবে প্রোটিন সংশ্লেষ সমাপ্ত হয়।

2.4.5 সারাংশ

বস্তুত সকল প্রকার প্রাণীর ক্ষেত্রে DNA এবং কিছু ভাইরাসের ক্ষেত্রে RNA-ই হল বংশগতির বাহক। DNA অর্থাৎ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড ডিঅক্সি রাইবোজ নামক পেন্টোজ সুগার, ফসফেট গ্রুপ এবং চার প্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত বেস, যথা অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন নিয়ে গঠিত। অপর পক্ষে RNA অর্থাৎ রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডে রাইবোজ নামক পেন্টোজ সুগার, ফসফেট গ্রুপ এবং অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন এবং ইউরাসিল এই চার ধরনের নাইট্রোজেন ঘটিত বেস থাকে।

একটি DNA অণু, দুটি পলিডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডের দণ্ডের দ্বারা তৈরী। অনেকগুলি ডিঅক্সি-রাইবোনিউক্লিওটাইড পরপর যুক্ত হয়ে একটি পলিডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড গঠন করে। আবার একটি ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড গঠিত হয় একটি ফসফরিক অ্যাসিড, একটি ডিঅক্সিরাইবোজ সুগার ও একটি বেসের সুনির্দিষ্ট মিলনে।

পলিডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড দণ্ড দুটি ঘোরানো সিঁড়ির মত ডানদিকে প্যাঁচ দেওয়া থাকে এবং প্রতি 34Å দূরত্বে একটি করে প্যাঁচ পূর্ণ হয়। প্রতি প্যাঁচে দশটি করে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইড থাকে।

DNA, বংশগতির বৈশিষ্ট্য সমূহ এক জনু থেকে পরবর্তী জনুতে স্থানান্তরিত করে; এটি RNA-সংশ্লেষ করে এবং প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রিণ করে। এটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোষের সকল প্রকার জৈবিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।

DNA বংশগতির বাহক এবং ধারক তা গ্রিফিথের পরীক্ষা, অ্যাভেরী, ম্যাকলিওড ও ম্যাক্‌কার্টির পরীক্ষা এবং হার্সে ও চেজের পরীক্ষা দ্বারা সঠিক ভাবে প্রমাণ করা যায়।

RNA একটি মাত্র বৃহৎ তন্ত্রী নিয়ে গঠিত। RNA আবার ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যেমন mRNA, tRNA, rRNA, snRNA।

DNA রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে নির্ভুল প্রতিলিপি গঠন করতে পারে। ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে DNA থেকে RNA এবং ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে RNA থেকে প্রোটিন তৈরী হয়।

2.4.6 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) DNA এবং RNA-এর গঠন বর্ণনা করুন।

(২) DNA এবং RNA-এর গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(৩) সংক্ষেপে গ্রিফিথের পরীক্ষাটি বর্ণনা কর। অ্যাভেরী ও তাঁর বন্ধুরা পরবর্তীকালে কি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন?

(৪) DNA বংশগতির বাহক — হার্সে এবং চেজ এর পরীক্ষায় এটি কিভাবে প্রমাণিত হয়?

(৫) RNA-কি বংশগতির বাহক হতে পারে? একটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করুন।

(৬) রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং ট্রান্সলেশন সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) DNA-এর ভৌত গঠন বর্ণনা করুন।

(২) DNA এবং RNA-এর রাসায়নিক গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(৩) DNA বংশগতির বাহক তা কে প্রথম এবং কিভাবে প্রমাণ করেন?

(৪) বংশগতির বাহকের ধর্মগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৫) সংক্ষেপে DNA-এর প্রতিলিপি গঠন বর্ণনা করুন।

(৬) কোন প্রক্রিয়ায় DNA থেকে RNA তৈরী হয়?

(৭) জেনেটিক কোড বলতে কি বোঝ? স্টার্ট কোডন ও স্টপ কোডনগুলি কি কি?

(৮) রাইবোজোমে প্রোটিন সংশ্লেষের পদ্ধতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

একক 2.5 ❑ মানুষ এবং ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination in man and *drosophila*)

গঠন

2.5.1 প্রস্তাবনা

2.5.2 Y-ক্রোমোজোমের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ

2.5.3 অতিরিক্ত X-ক্রোমোজোম এবং ডোসেজ কমপেনসেশন

2.5.4 পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y-ক্রোমোজোমাল জীন

2.5.5 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণ

2.5.6 ব্রীজেসের পরীক্ষা

2.5.7 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণের একটি ছক

2.5.8 ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনসেশন ঃ 1X-কে 2X-এ পরিণত করা

2.5.9 সারাংশ

2.5.10 প্রশ্নাবলী

2.5.1 ভূমিকা

এই অধ্যায়ে আমরা মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করব। আমরা জানি যে, স্বাভাবিক মানুষের ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা 46। এর মধ্যে 22 জোড়া হল অটোজোম, অর্থাৎ এই সব ক্রোমোজোম দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (somatic characters) বাহক জীন বহন করে। বাকী 1 জোড়া হল সেক্স ক্রোমোজোম, অর্থাৎ এই ক্রোমোজোমগুলি জীবের লিঙ্গ নির্ধারণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে। সেক্স ক্রোমোজোম দুই প্রকারের হয় 'X' এবং 'Y'। স্বাভাবিক পুরুষে X এবং Y ; এবং স্বাভাবিক মহিলাতে X- এই এক প্রকারের ক্রোমোজোম থাকে। স্বাভাবিক পুরুষকে আমরা XY এবং স্বাভাবিক মহিলাকে আমরা XX- এই চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করে থাকি।

মানুষে Y-ক্রোমোজোমই প্রধানত লিঙ্গ নির্ধারণ করে বলা যেতে পারে। Y ক্রোমোজোম উপস্থিত থাকলে পুরুষের এবং অনুপস্থিত থাকলে মহিলার সৃষ্টি হয়। Y ক্রোমোজোমের গুরুত্ব বোঝা যায় কিছু কিছু সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যার কমবেশীতে যেসকল পরিবর্তন হয় তার মাধ্যমে। মানুষের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজোমের কম বেশী সংখ্যার জন্য যে সকল বিশেষ বৈশিষ্ট দেখা যায় তাদের সিনড্রোম বলে (Syndrome)।

2.5.2 Y-ক্রোমোজোমের মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ

Y-ক্রোমোজোম যে মানুষে লিঙ্গ নির্ধারণ করে তার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় মিয়োটিক ননডিসজাংশনের (meiotic nondisjunction) ফলে উদ্ভূত হওয়া এক ধরনের অস্বাভাবিক সেক্স ক্রোমোজোমের পরিপূরকতা দেখে (sex chromosome complement)।

ননডিসজাংশনের ফলে অনেক ধরনের অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে একটি হল XO মানুষজন। এদের X ক্রোমোজোম থাকে, কিন্তু কোনও Y ক্রোমোজোম থাকে না। এদের অটোজোমগুলি স্বাভাবিকই থাকে এবং এরা মহিলা হন কিন্তু এই সকল মহিলারা বন্ধ্যাত্বের শিকার হন (Sterile)। এই সকল মহিলাদের কেরিওটাইপ (কোষে মেটাফেজ ক্রোমোজোমের একটি সম্পূর্ণ সেট) লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এদের দুটির স্থানে একটি মাত্র সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। এই ধরনের ঘটনা 20000-এ 1টি হয়। যে সহজাত অস্বাভাবিকতায় এরা ভোগেন তাকে বলা হয় **টার্নার সিনড্রোম** (Turner syndrome)। এটি হিসেব করে দেখা গেছে যে প্রায় 99 শতাংশ 45, X-ভ্রূণ জন্মের আগেই মারা যায়। 1938 খ্রিস্টাব্দে হেনরী এইচ টার্নার (Henry H. Turner) প্রথম এইরূপ সিন্ড্রোম লক্ষ্য করেন। এই রোগে মহিলারা সাধারণত অস্বাভাবিক বেঁটে হন, গলার পিছনের চামড়া কুঞ্চিত হয়। ঢালের ন্যায় বক্ষ ও চওড়া ঘাড় হয়। এদের যৌবনে যৌন বৈশিষ্টগুলি প্রকাশিত হয় না, ডিম্বাশয় খুব ছোট হয় অথবা অনেক সময় থাকেও না।

XO মানুষে এই ধরনের অস্বাভাবিকতা প্রমাণ করে যে, মহিলাদের স্বাভাবিক গঠনের জন্য দুটি X-ক্রোমোজোম অত্যাবশ্যকীয়।

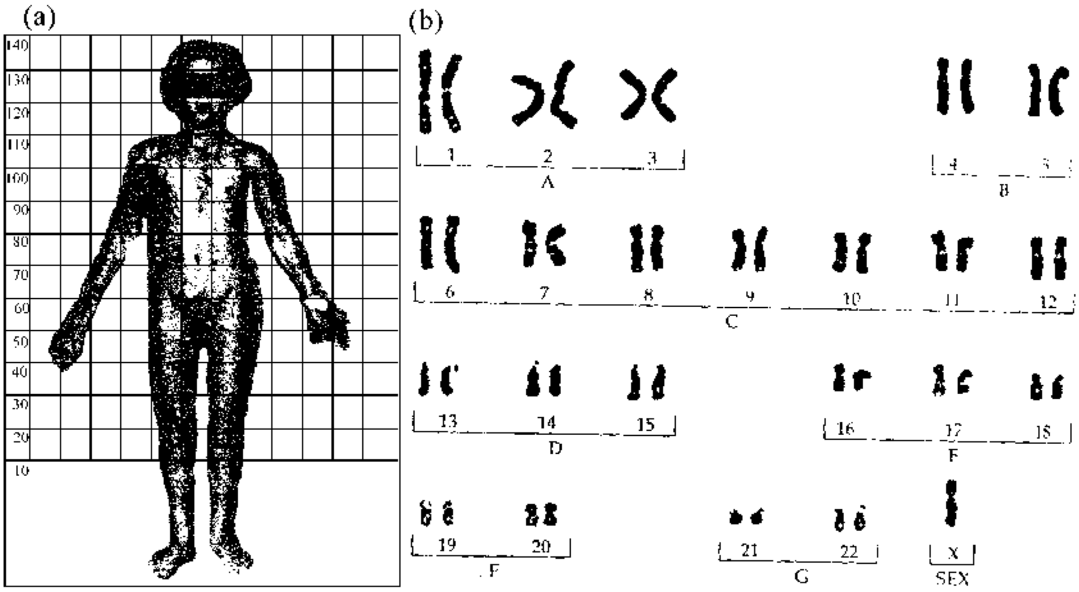

চিত্র 5.1 ঃ টার্নার সিনড্রোম (XO) : (a) এই সিনড্রোম বিশিষ্ট মহিলা; (b) কেরিওটাইপ।

ননডিসজাংশনের ফলে অনেক সময় XXY ধরনের মানুষের সৃষ্টি হয়। এরা সাধারণতঃ পুরুষ হয় এবং তারা ক্লাইনফেলটার সিনড্রোমে ভোগেন। 1942 খ্রিস্টাব্দে আমেরিকান চিকিৎসক হ্যারী এফ. ক্লাইনফেল্টার (Harry F. Klinefelter) এই সিন্ড্রোমের আবিষ্কর্তা। এটি পুরুষদের একপ্রকার যৌন অস্বাভাবিকতা সমন্বিত ব্যাধি যাতে পুরুষের (1) শুক্রাশয় অতি ক্ষুদ্র, (2) স্ফীত স্তনগ্রন্থি, (3) অনুন্নত গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য এবং (4) উপাঙ্গগুলি লম্বা হয়।

পরবর্তীকালে এডিনবার্গের ওয়েস্টার্ন জেনারেল হাসপাতালে এ. জ্যাকব (A. Jacob) এবং জে. এ. স্ট্রং (J. A. Strong) প্রথম এই সিনড্রোমগ্রস্থ রোগীর 47 টি ক্রোমোজোম গণনা করেন। এই অতিরিক্ত ক্রোমোজোমটি হল 'X'। এর থেকেই জানা যায় যে XXY সমন্বিত ব্যক্তিদের ক্লাইনফেল্টার হয়। পরবর্তীকালে এই ক্লাইনফেল্টার সিন্ড্রোমগ্রস্থ রোগীদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ক্রোমোজোম সংখ্যা পাওয়া গেছে, যাদের X ক্রোমোজোমের সংখ্যা

ক্রমাগত বাড়তে থাকে। যেমন — 47 = 44A + XXY; 48 = 44A + XXXY; 49 = 44A + XXXXY। এই ধরনের ঘটনা 1000-এ 1টি হয়। ক্লাইনফেল্টার মানুষজনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অস্বাভাবিকতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে পুরুষদের স্বাভাবিক গঠনের জন্য একটি X এবং একটি Y ক্রোমোজোম অতি আবশ্যক।

উপরের উদাহরণগুলি ছাড়াও আমরা XYY সিনড্রোম এবং XXX সিনড্রোম দেখতে পাই। 47, XYYY-রা হল পুরুষ এবং মিয়োসিসে Y-ক্রোমোজোমে ননডিসজাংশনের ফলেই এটা হয়। 47, XXX-রা হল মহিলা (triplox)। এরা মোটামুটি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এদের মধ্যে বন্ধ্যাত্বতা দেখা যায়।

2.5.3 অতিরিক্ত X-ক্রোমোজোম এবং ডোসেজ কমপেনসেশন (Dosage Compensation Mechanism for Extra X-Chromosome)

সেক্স ক্রোমোজোমের কার্যাবলী, লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া বোঝার পক্ষে একটি ভিন্ন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে। কারণ X -ক্রোমোজোমে যে সকল জীন থাকে, Y-ক্রোমোজোমে সেগুলি থাকে না। অতএব, মহিলাদের ক্ষেত্রে X-ক্রোমোজোমের, ডবল ডোজ (Double dose) বা দুই মাত্রা থাকে। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে থাকে একমাত্রা। এখন প্রশ্ন, কিভাবে এই জীনমাত্রার অসমতা দূরীভূত হয়। ভারসাম্যের এই অসাম্য দূরীকরণ হয় এক বা একাধিক ক্রোমোজোমের ঘনীভূত হওয়ার ফলে এবং এর ফলে প্রজননিক অর্থে একটিমাত্র X ক্রোমোজোমই সক্রিয় থাকে। এই ঘনীভূত ক্রোমোজোমকেই **বার বডি** (Barr Body) বলা হয়। মুরে বার (Murray Barr) প্রথম এই বার বডি আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে স্বাভাবিক XX মহিলাদের একটি মাত্র ঘনীভূত ক্রোমাটিন বা বার বডি থাকে এবং XY পুরুষদের কোনও বার বডি থাকে না। পরবর্তীকালে 1961 খ্রীস্টাব্দে লিওন (Lyon) তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর মতে—

(১) বার বডি হল ঘনীভূত X-ক্রোমোজোম ছাড়া আর কিছুই না।

(২) নিষেকের পর 16 দিনের থেকেই এই X-ক্রোমোজোমের নিষ্ক্রিয়তা শুরু হয়।

(৩) পিতা এবং মাতার থেকে প্রাপ্ত, কোন X-ক্রোমোজোম নিষ্ক্রিয় হবে তা এলোপাথাড়িভাবে (randomly) ঠিক হয় এবং এক কোষ থেকে অন্য কোষে সেটা স্বাধীন ভাবে হয়।

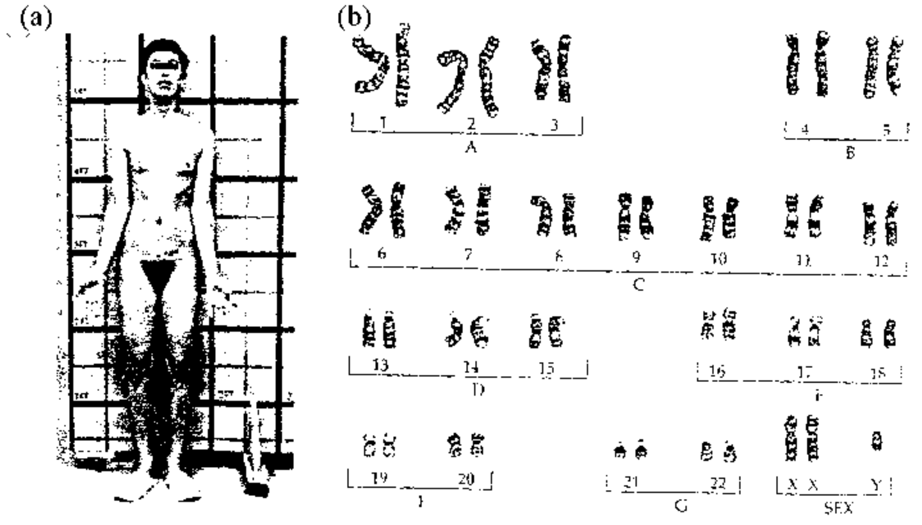

চিত্র 5.2 ঃ ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম (XXY) : (a) এই সিনড্রোম বিশিষ্ট পুরুষ, (b) কেরিওটাইপ।

Table ঃ X এবং Y ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে মানুষের বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা এবং লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা ঃ

ক্রোমোজোমের সংখ্যা	অস্বাভাবিকতা	সম্ভাব্য বার বডির সংখ্যা
46, XX	স্বাভাবিক ♀	1
46, XY	স্বাভাবিক ♂	0
45, X	টার্নার সিনড্রোম ♀	0
47, XXX	ট্রিপলো - X ♀	2
47, XXY	ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম ♂	1
48, XXXY	ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম ♂	2
48, XXYY	ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোম ♂	1
47, XYY	XYY সিনড্রোম ♂	0

যে সাধারণ ফরমুলার দ্বারা বার বডির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় সেটি হল → X-ক্রোমোজোমের সংখ্যা–1

স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক মানুষের X-ক্রোমোজোমের সঙ্গে বার বডির সংখ্যার সদৃশতা উপরের টেবিলে দেখানো হয়েছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডোসেজ কমপেনসেশনে X-ক্রোমোজোম নিষ্ক্রিয়তার বিভিন্ন কারণ খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছেন। অনেক বিজ্ঞানীর মতে X-ইনঅ্যাক্টিভেশন সেন্টার (X-inactivation centre)-এ, X-ক্রোমোজোমের প্রথম নিষ্ক্রিয় হওয়া শুরু হয় এবং এর পর এটি ক্রোমোজোমের উভয় দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একটি X-ক্রোমোজোমাল জীন, যার নাম **XIST** (for X inactive specific transcripts) সেটি এই নিষ্ক্রিয়তার ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে একমাত্র নিষ্ক্রিয় X-ক্রোমোজোমেই এই জীনটি সক্রিয় থাকে এবং সক্রিয় X-ক্রোমোজোমে এই জীনটি নিষ্ক্রিয় থাকে। এই জীনটি অন্যান্য X-ক্রোমোজোমাল জীনগুলি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু কিভাবে এই **XIST** জীনটি নিষ্ক্রিয় X-ক্রোমোজোমে সক্রিয়ভাবে কাজ করে, তা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়।

2.5.4 পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y-ক্রোমোজোমাল জীন (The gene on the Y chromosome for male sex determination)

যেহেতু Y ক্রোমোজোম পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে, এর থেকে বোঝা যায় যে Y-ক্রোমোজোমে কিছু নির্দিষ্ট জীন আছে যাদের প্রকাশিত বস্তু (product) পুরুষের লিঙ্গ নির্ধারণে সক্ষম। এই নির্ধারিত বস্তুটি হল টেস্টিস ডিটারমিনিং ফ্যাক্টর (testis determining factor) বা যেটি পুরুষে টেস্টিস তৈরী হতে সাহায্য করে এবং সেই জীনটিকে বলা হয় **TDF** gene (Testis Determining Factor gene)। এই জীনটিই প্রথম জনন কোষকে ডিম্বাশয় না করে শুক্রাশয়ে পরিণত করে। সাম্প্রতিক কালে রিকম্বিনেন্ট DNA টেকনোলজির সাহায্যে TDF জীনটিকে সনাক্ত করা এবং তার ধর্মসমূহ জানা সম্ভব হয়েছে।

সম্প্রতি **SRY** (Sex Determining Region Y) নামক অপর একটি Y-ক্রোমোজোমাল জীন আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটি TDF জীনের মতই। এখন প্রশ্ন হল কি করে এই জীনটিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মানুষের

লিঙ্গ নির্ধারণ করার সময় বিজ্ঞানীরা এক ধরনের XX পুরুষ এবং XY মহিলা সনাক্ত করেন। পরীক্ষা করে দেখা যায় যে এই XX-পুরুষের Y ক্রোমোজোমের ছোট বাহুর উপরের দিকের একটি অংশ ভেঙ্গে দুটি X-ক্রোমোজোমের মধ্যে একটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

অপরপক্ষে XY মহিলাতে Y ক্রোমোজোমের ঐ নির্দিষ্ট অংশটি অবলুপ্ত ছিল। উপরের এই ঘটনাগুলি থেকে এটাই বোঝা যায় যে পুরুষদের ক্ষেত্রে যে জীনটি শুক্রাশয় তৈরী করে, সেটি Y-ক্রোমোজোমের ছোট বাহুটির উপরের অংশে অবস্থিত। এই জীনটিই হল SRY জিন। এই জীনটিই পুরুষে লিঙ্গ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। শুক্রাশয় থেকে নিঃসরিত বিভিন্ন ধরনের হরমোন লিঙ্গ নির্ধারণে গৌণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে টেস্টোস্টেরণ এবং অ্যান্টিমুলারিয়ান হরমোন অন্যতম। শুক্রাশয়ের লিডিগ কোষ এবং সারটোলি কোষ থেকে এরা যথাক্রমে নিঃসরিত হয়।

এছাড়াও দুটি জীন **SOX9** এবং **SFI** শুক্রাশয় তৈরীতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই জীন দুটি হল অটোজোমাল জীন। ঠিক সেই রকমই **Wnt4a** এই অটোজোমাল জীনটি ডিম্বাশয় তৈরীতে সাহায্য করে। এছাড়াও ডিম্বাশয় তৈরীর জন্য একটি X-ক্রোমোজোমাল জীন খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটি হল **DAX1**।

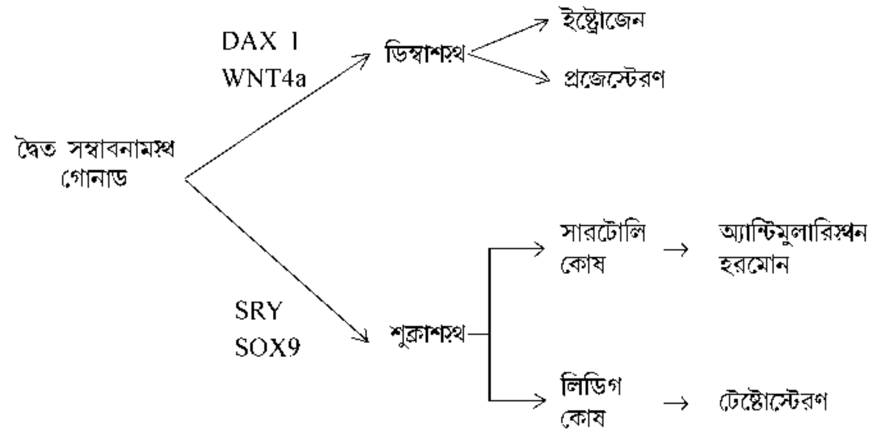

চিত্র 5.3 ঃ জীন এবং হরমোনের সমন্বয়ে মানুষের মুখ্য এবং গৌণ লিঙ্গ নির্ধারণের একটি ছক

ডিম্বাশয় থেকে নিঃসারিত দুটি হরমোন ইস্ট্রোজেন এবং প্রজেস্টেরন মহিলাদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ধারণে গৌণ ভূমিকা পালন করে।

2.5.5 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination in *Drosophila*)

ড্রসোফিলা মাছি অতি ক্ষুদ্র ফলের মাছি। এরা ডিপ্‌টেরা বর্গের পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণী। বংশগতির নানা পরীক্ষা নিরীক্ষায় এই মাছি ব্যবহার করে বংশগতির নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আবিষ্কার করা সম্ভবপর হয়েছে বলে একে জেনেটিক্সের সিনডারেলা (Cinderella) বলা হয়। 1909 খ্রিস্টাব্দে মরগ্যান (T. H. Morgan) প্রথম ড্রসোফিলা মাছি বংশগতির পরীক্ষায় ব্যবহার করেন।

পুরুষ এবং স্ত্রী ড্রসোফিলার বহিরাকৃতির স্পষ্ট তফাৎ আছে। স্ত্রী ড্রসোফিলাগুলি আকৃতিতে বড় হয় এদের বক্ষদেশের কূর্চ (bristle) খুব বড় হয় এবং এদের উদরে পাঁচটি গাঢ় ব্যান্ড আছে। পুরুষ ড্রসোফিলা আকৃতিতে ছোট হয়। বক্ষদেশের কূর্চ খুব ছোট হয় এবং এদের উদরে তিনটি ব্যান্ড আছে।

ড্রসোফিলায় (*Drosophila melanogaster*) 4 জোড়া ক্রোমোজোম থাকে, এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম এবং তিন জোড়া অটোজোম। এদের ক্ষেত্রে স্ত্রীরা হল হোমোগ্যামেটিক (XX) এবং পুরুষরা হল হেটারোগ্যামেটিক (XY)। যদিও এদের ক্ষেত্রে Y ক্রোমোজোম লিঙ্গ নির্ধারণে কোন ভূমিকা পালন করেনা। এদের ক্ষেত্রে X-**ক্রোমোজোমের সংখ্যা এবং অটোজোমের সেটের সংখ্যার অনুপাতের** দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিক স্ত্রী ড্রসোফিলায় দুটি X ক্রোমোজোম এবং দুই সেট অটোজোম থাকে। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে X ঃ A হল 1। স্বাভাবিক পুরুষ ড্রসোফিলায় একটি X ক্রোমোজোম এবং দুই সেট অটোজোম থাকে অর্থাৎ এদের X ঃ Y হল 0·50। যদি এই X ঃ A অনুপাত 1 অথবা 1-এর বেশি হয় তাহলে স্ত্রী ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। যদি এই X ঃ A অনুপাত 0·50 অথবা এর কম হয় তাহলে পুরুষ ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। যখন এই অনুপাত 0·50 এবং 1-এর মধ্যবর্তী হয় তাহলে মাছিটি পুরুষ অথবা মহিলা না হয়ে **ইন্টারসেক্স** হয়। এই ধরনের মাছিদের শরীরের ভিতরে অবস্থিত লিঙ্গ নির্ধারক অঙ্গগুলি এবং জেনিটালিয়া, পুরুষ এবং স্ত্রী মাছিগুলির শরীরে অবস্থিত অঙ্গগুলির মিশ্রণে তৈরী হয় এবং এরা প্রজননে অসমর্থ হয়।

ব্রিজেস (Bridges) 1922 খ্রিস্টাব্দে, ড্রসোফিলা নিয়ে পরীক্ষা করার সময় হঠাৎ একপ্রকার স্ত্রী মাছি পান, যারা ট্রিপ্লয়েড (3n) স্ত্রী মাছি। অনেক সময় এইরকম ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী মাছির জননকোষ সৃষ্টির সময় মিয়োসিসে সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পৃথক না হয়ে একটি গ্যামেটেই প্রবেশ করে। এই পদ্ধতিকে বলে ননডিসজাংশন (nondisjunction)। ব্রিজেস এই এরকম একটি ননডিসজাংশনাল স্ত্রী মাছির সঙ্গে একটি স্বাভাবিক মাছির মিলন ঘটান। এর থেকে তৈরী হওয়া XXX বহনকারী স্ত্রী মাছিগুলিকে বলা হয় **সুপার ফিমেল**। এরা বাঁচে না। ব্রিজেস এই প্রকার স্ত্রী মাছির সঙ্গে পুনরায় স্বাভাবিক মাছির মিলন ঘটান। এই প্রকার পরীক্ষাকে সেকেন্ডারী ননডিসজাংশন পরীক্ষা বলে। এই পরীক্ষায় সুপার ফিমেল, ইন্টারসেক্স, পুরুষ এবং সুপার মেল এই চার ধরনের অপত্য মাছি সৃষ্টি হয়।

2.5.6 ব্রীজেসের পরীক্ষা

(ক) নন ডিসজাংশনের ফলে সুপার ফিমেল তৈরী ঃ

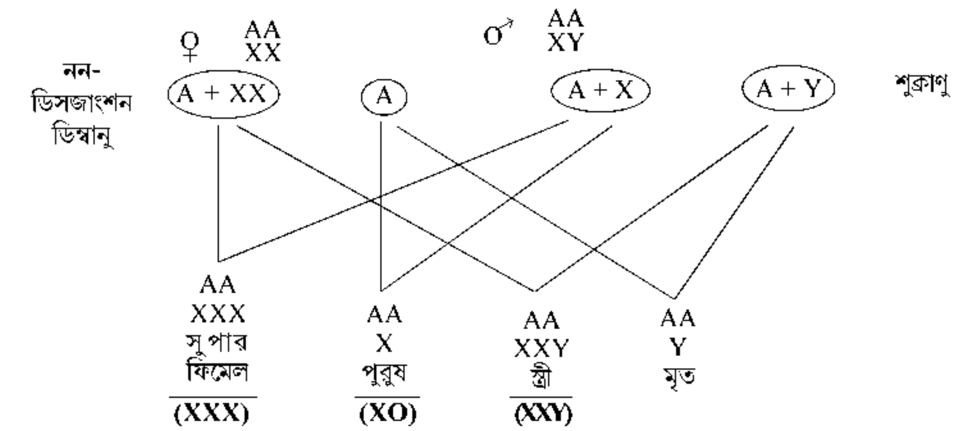

(খ) সুপার ফিমেলের সঙ্গে সাধারণ পুরুষের মিলন ঃ

একটি ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী মাছি (3A3X) চার প্রকার ডিম্বানু (2A2X, AX, A2X, 2AX) উৎপন্ন করে। একটি স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড পুরুষ দুই প্রকার শুক্রাণু (AX, AY) উৎপন্ন করে।

ডিম্বাণু

	AX	2AX	A2X	2A2X
শুক্রাণু AX	2A 2X ডিপ্লয়েড স্ত্রী	3A 2X ইন্টারসেক্স	2A 3X সুপার স্ত্রী	3A 3X ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী
AY	2AXY ডিপ্লয়েড পুং	3AXY সুপার পুং	2A 2XY ডিপ্লয়েড স্ত্রী	3A 2XY ইন্টারসেক্স

তালিকা ঃ ট্রিপ্লয়েড ফিমেল এবং স্বাভাবিক পুরুষের মিলনের ফলাফল ঃ

ক্রোমোজোম সমাবেশ	লিঙ্গের প্রকার	অটোজোম সেট	X-ক্রোমোজোমের সংখ্যা	X ঃ Y অনুপাত মূল্য
3A3X	ট্রিপ্লয়েড স্ত্রী	3	3	1
2A2X	স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড স্ত্রী	2	2	1
2A2XY	ডিপ্লয়েড স্ত্রী	2	2	1
3A2X	ইন্টারসেক্স	3	2	0·67
3A2XY	ইন্টারসেক্স	3	2	0·67
2AXY	স্বাভাবিক পুং	2	1	0·50
2A3X	সুপার স্ত্রী	2	3	1·50
3AXY	সুপার পুং	3	1	0·23

উপরের তালিকা থেকে এটাই বোঝা যায় যে X ঃ A অনুপাতের উপরেই ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয় এবং লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোম কোনও ভূমিকা পালন করে না।

এই X ঃ A অনুপাত প্রকৃতপক্ষে কিছু X-লিঙ্গ ''নিউমারেটর'' জিন এবং অটোজোমালি ''ডিনমিনেটর'' জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। **sis - a, sis - b, sis - c** এবং **run** ইত্যাদি হল নিউমারেটর (Numerator) জিনের উদাহরণ। অপর পক্ষে **dpn** হল ডিনমিনেটর জিনের উদাহরণ। ভ্রূণ তৈরীর সময় কিছু জিন প্রকাশিত বস্তু স্ক্রোলি মায়েদ্ধ থেকে আসে যেমন **da, her, emc** এবং **gro** বিভিন্ন নিউমারেটর এবং ডিনমিনেটর প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে SIS প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে। এই প্রোটিন প্রথম **Sxl** জিন থেকে **Sxl** প্রোটিন হতে সাহায্য করে। পুরুষ এবং স্ত্রী ড্রসোফিলাতে দুটি ভিন্ন প্রোমোটারের (Promoter) মাধ্যমে Sxl প্রোটিন তৈরী হয় এর ফলে দুটি ভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ এবং স্ত্রী ড্রসোফিলা তৈরী হয়। স্ত্রী ড্রসোফিলায় একটি ক্রিয়াশিল Sxl প্রোটিন তৈরী হয় কিন্তু পুরুষ মাছিতে কোনো ক্রিয়াশীল Sxl প্রোটিন তৈরী হয় না, Sxl প্রোটিন স্ত্রী মাছিতে tra pre mRWA থেকে একটি ক্রিয়াশিল tra প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে। অপরপক্ষে পুরুষ মাছিতে

কোন কার্যক্ষম tra প্রোটিন তৈরী হয় না। স্ত্রী মাছিতে tra প্রোটিন, tra 2 প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে dsx pre - mRNA থেকে dsx ♀ প্রোটিন তৈরী করে। অপরদিকে পুরুষে dsx ♂ প্রোটিন তৈরী হয়। Dsx ♀ প্রোটিন ix প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরুষ পৃথকীকরণের জিনগুলি দমিয়ে রাখে এবং এর থেকে স্ত্রী ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে dsx ♂ প্রোটিন স্ত্রী পৃথকীকরণের জিনগুলি দমিয়ে রাখে এবং এর থেকে পুরুষ ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। উপরের এই পুরো ঘটনাটি ছকের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হল।

2.5.6 ড্রসোফিলায় লিঙ্গ নির্ধারণের একটি ছক ঃ

X ঃ A অণুপাত

1·0 (XX স্ত্রী)

Genes: Sxl → tra → dsx → দেহ কোষ পৃথকীকরণ

RNA তৈরী হচ্ছে; প্রি -mRNA একটি নির্দিষ্ট পথে প্রোটিন তৈরী করছে।

↓

Sxl প্রোটিন

↓

Sxl প্রোটিন tra Pre - mRNA-কে একটি নির্দিষ্ট প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করছে।

↓

tra প্রোটিন

↓

tra প্রোটিন tra-2 প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে dsx pre-mRNA থেকে নির্দিষ্ট একটি প্রোটিন তৈরী করতে সাহায্য করে যদি শুধুমাত্র স্ত্রী ড্রসোফিলাতে হয়

↓

dsx ♀ প্রোটিন

↓

dsx ♀ প্রোটিন ix প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরুষ পৃথকীকরণের জিনগুলি দমিয়ে রাখে।

↓

♀ ড্রসোফিলা

1·5 (XY পুরুষ)

RNA তৈরী হচ্ছে; প্রি -mRNA ভিন্ন পথে mRNA তৈরী করছে। কোনও স্বাভাবিক ক্রিয়ামূলক প্রোটিন তৈরী হয় না।

↓

কোনও ক্রিয়ামূলক Sxl প্রোটিন তৈরী হয় না।

↓

কোনও ক্রিয়ামূলক Sxl প্রোটিন উপস্থিত না থাকায় tra Pre mRNA-এ থেকে অন্য ভাবে প্রোটিন তৈরী হচ্ছে।

↓

কোনও ক্রিয়ামূলক tra প্রোটিন তৈরী হয় না।

↓

কোনও ক্রিয়ামূলক tra প্রোটিন না থাকায় dsx – pre mRNA থেকে অন্য ভাবে প্রোটিন তৈরী হয়।

↓

dsx ♂ প্রোটিন

↓

dsx ♂ প্রোটিন স্ত্রী পৃথকীকরণের জীনগুলি দমিয়ে রাখে।

↓

♂ ড্রসোফিলা

2.5.8 ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনসেশন ঃ 1X-কে 2X-এ পরিণত করা

পুরুষ ড্রসোফিলাতে হেটারোমরফিক সেক্স ক্রোমোজোম দেখা যায় কিন্তু স্ত্রী ড্রসোফিলায় দুটি X-ক্রোমোজোম দেখা যায়। পুরুষ ড্রসোফিলায় X ক্রোমোজোমের হাইপারট্রান্সক্রিপটিভ কার্যক্রমের (hypertranscriptive activity) দ্বারাই ডোসেজ কমপেনসেশন হয়ে থাকে (মুখার্জী এবং মীরম্যান, 1965)। 1981 খ্রিস্টাব্দে এবং 1985 খ্রিস্টাব্দে পৃথক পৃথক ভাবে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী আর. এন. চ্যাটার্জী এবং বিজ্ঞানী এ. মুখার্জী দেখান যে পুরুষ ড্রসোফিলার একটি X ক্রোমোজোমে ননহিস্টোন ক্রোমোটিন প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে এবং এর ফলেই এই X ক্রোমোজোম অতিরিক্ত কার্যক্রম যুক্ত হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন যে পুরুষ মাছির X-ক্রোমোজোমে msl - 1, msl - 2, msl - 3 এবং mle এই চার প্রকার জিনের উপস্থিতি। এদের প্রোটিনগুলিই প্রকৃত পক্ষে ডোসেজ কমপেনসেশনের জন্য দায়ী। স্ত্রী মাছিতে এই চার প্রকার জীনের কোনটিই উপস্থিত নয়। উপরোক্ত প্রোটিন চারটিকে একত্রে MSL প্রোটিন বলা হয়। বিজ্ঞানীরা এও দেখিয়েছেন যে rox1 এবং rox2 এই দুইটি জিনের RNA, MSL প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি RNA-প্রোটিন কমপ্লেক্স (complex) তৈরী করে এবং সেটি ডোসেজ কমপেনসেশনে সাহায্য করে। এই rox - RNA গুলিই পুরুষ ড্রসোফিলার X ক্রোমোজোমের সঙ্গে MSL প্রোটিনগুলিকে একত্রিত হতে সাহায্য করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

2.5.9 সারাংশ

জন্মের সময় কীভাবে জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ হয় তা নিয়ে অনেকদিন ধরেই নানা আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন জীবে লিঙ্গ নির্ধারণের ক্রিয়াকৌশলও ভিন্ন। লিঙ্গ নির্ধারণ প্রধানত ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রিত, তবে অনেক সময় হরমোন এবং পরিবেশের প্রভাবও লিঙ্গ নির্ধারণে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণ হেটারোগ্যামেসিস বা সেক্স ক্রোমোজোম প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। পুরুষের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজোমগুলি হল XY এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে XX। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ Y ক্রোমোজোমের উপস্থিতিতে পুরুষের এবং অনুপস্থিতিতে মহিলার সৃষ্টি হয়। Y ক্রোমোজোমের TDF জীনটিই এর জন্য দায়ী। মানুষের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার তারতম্যের ফলে যে সকল বৈশিষ্ট্য জীবে প্রকাশ পায় তাদের সিনড্রোম বলে।

পুরুষের ক্ষেত্রে একটি X ক্রোমোজোম এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে দুটি X ক্রোমোজোম থাকা সত্ত্বেও জীনগত বৈশিষ্ট্য মহিলাদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয় না। ডোসেজ কমপেনসেশনের ফলেই এটা সম্ভব হয়। Xist নামক X-ক্রোমোজোমাল একটি জীন ডোসেজ কমপেনসেশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ড্রসোফিলা মাছিতে X-ক্রোমোজোমে এবং অটোজোমে অবস্থিত জীনের সংখ্যাগত ভারসাম্যের উপর লিঙ্গ নির্ধারণ নির্ভরশীল। যখন X-ক্রোমোজোম এবং অটোজোম সেটের অনুপাত অর্থাৎ X ঃ A, 1 অথবা 1 এর বেশি হয় তখন স্ত্রী ড্রসোফিলা এবং যখন X ঃ A, 0·5 বা এর কম হয় তখন পুরুষ ড্রসোফিলার সৃষ্টি হয়। ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোম কোনও ভূমিকা পালন করে না। Sxl, tra, ix, dsx প্রভৃতি জীনগুলিই এবং এই জীনগুলির থেকে সৃষ্ট RNA এবং প্রোটিনই প্রকৃতপক্ষে লিঙ্গ নির্ধারণে দায়ী। আবার msls এবং mle ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনশেনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

2.5.10 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) সেক্স ক্রোমোজোম বলতে কি বোঝো? মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে এই সেক্স ক্রোমোজোমের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(২) বারবডি কাকে বলে? এর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

(৩) ডোসেজ কমপেনসেশন বলতে কি বোঝ? কিভাবে Xist জীনটি ডোসেজ কমপেনসেশনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৪) "Y ক্রোমোজোম মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে" — এই বক্তব্যটিতে TDF-এর ভূমিকা কতখানি তা স্বযুক্তিসহ লিখুন।

(৫) ড্রসোফিলা মাছিতে কিসের দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারিত হয়? Y ক্রোমোজোমের কোনও প্রভাব কি লিঙ্গ নির্ধারণে আছে? ব্রিজের পরীক্ষাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৬) ড্রসোফিলার লিঙ্গ নির্ধারণে 'নিউমারেটর', 'ডিনমিনেটর' এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জীনগুলির ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৭) ড্রসোফিলার ডোসেজ কমপেনসেশনে কোন কোন জীন মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং তাদের কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) হোমোগ্যামেটিক এবং হেটারোগ্যামেটিক সেক্স বলতে কি বোঝো?

(২) মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে Y ক্রোমোজোমের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

(৩) টার্নার সিন্ড্রোম বলতে কি বোঝো? এই অস্বাভাবিকতার লক্ষণগুলি কি?

(৪) ক্লাইন ফেল্টার সিনড্রোমের ক্যারিওটাইপ কি? এই সিনড্রোমের লক্ষণগুলি বর্ণনা করুন।

(৫) জেনেটিক্সের সিন্ডারেলা কাকে বলে? এর কারণ কি?

(৬) সুপার ফিমেল বলতে কি বোঝেন? এর ক্যারিওটাইপ বর্ণনা করুন।

(৭) msl জীন সম্পর্কে স্বল্প জান লিখুন।

(৮) Xist কথাটির পুরো অর্থ কি? এই জীনের ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৯) TDF কথাটির পুরো অর্থ কি? এর সম্পর্কে স্বল্প জান লিখুন।

(১০) লিওন তত্ত্ব বলতে কি বোঝেন?

একক 2.6 ❑ থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia)

গঠন

2.6.1 প্রস্তাবনা

2.6.2 থ্যালাসেমিয়ার প্রকার

2.6.3 α-থ্যালাসেমিয়া

2.6.4 β-থ্যালাসেমিয়া

2.6.5 থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ

2.6.6 চিকিৎসা প্রণালী

2.6.7 সারাংশ

2.6.8 প্রশ্নাবলী

2.6.1 ভূমিকা

স্বাভাবিক মানুষের ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা 46। এর মধ্যে 22 জোড়া হল অটোজোম এবং এক জোড়া হল সেক্স ক্রোমোজোম। থ্যালাসেমিয়া হল একটি অটোজোম বাহিত অস্বাভাবিকতা।

থ্যালাসেমিয়া কথাটি দুটি ভাগে বিভক্ত। থ্যালাসা এবং এমিয়া (Thalasa = the sea + emia = blood) — থ্যালাসা কথাটির অর্থ হল সমুদ্র এবং এমিয়া অর্থাৎ রক্ত।

থ্যালাসেমিয়া হল এমন একটি অস্বাভাবিকতা, যেটি পিতামাতা থেকে সন্তান সন্ততিতে যায়। এটি হল এক ধরনের অ্যানিমিয়া (anaemia) বা রক্তাল্পতা যেখানে হিমোগ্লোবিন তৈরীর জিনে ত্রুটি থাকে। আমরা জানি যে হিমোগ্লোবিন হল লোহিত রক্ত কণিকায় অবস্থিত এক ধরনের প্রোটিন, যেটি অক্সিজেন বহন করে।

2.6.2 থ্যালাসেমিয়ার প্রকার

বিভিন্ন ধরনের জিন, ভিন্ন ভাবে নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের থ্যালাসেমিয়া গঠন করে। হিমোগ্লোবিন সাধারণত α এবং β এই দুই ধরনের প্রোটিন চেইন দিয়ে তৈরী। যদি হিমোগ্লোবিনের α-গ্লোবিন অংশে অসুবিধার জন্য থ্যালাসেমিয়ার সৃষ্টি হয়, তখন তাকে α (আলফা) থ্যালাসেমিয়া বলা হয়। যখন হিমোগ্লোবিনের β (বিটা) গ্লোবিন অংশে ত্রুটির ফলে উপরোক্ত অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, তখন তাকে β থ্যালাসেমিয়া বলা হয়।

2.6.3 α-থ্যালাসেমিয়া

পিতা এবং মাতার প্রত্যেকের দুটি করে জিন নিয়ে মোট 4টি জিন হিমোগ্লোবিনের α-গ্লোবিন অংশ সৃষ্টি করে। এই জিনগুলির কোনও একটিতে ত্রুটির ফলে অথবা কোনও জিন অনুপস্থিত থাকলে α থ্যালাসেমিয়া হয়ে থাকে।

α থ্যালাসেমিয়া আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

(1) যে সমস্ত মানুষে উপরোক্ত 4টি জীনের একটিতে ত্রুটি থাকে, তারা হল থ্যালাসেমিয়া বহনকারী (silent carriers) এবং এদের মধ্যে এই রোগের কোন চিহ্নই দেখা যায় না।

(2) a গ্লোবিন অংশের দুটি জীনের ত্রুটির ফলে সামান্য রক্তাল্পতা (mild anemia) দেখা যায়। এরাই হল এই রোগের প্রকৃত বহনকারী (carriers)। এই ধরনের থ্যালাসেমিয়াকে-থ্যালাসেমিয়া মাইনর (a-thalassemia minor) বলা হয়।

(3) a-গ্লোবিন অংশের তিনটি জীনের ত্রুটির ফলে যে থ্যালাসেমিয়ার সৃষ্টি হয়, তাকে হিমোগ্লোবিন H-অস্বাভাবিকতা বলা হয়ে থাকে। এতে রোগীরা ভীষণ ধরনের রক্তাল্পতার শিকার হন।

(4) যে সমস্ত শিশুদের উপরোক্ত চারটি জীনই ত্রুটিযুক্ত হয়, তারা সাধারণত জন্মের পূর্বেই অথবা পরে মারা যায়। এই ধরনের থ্যালাসেমিয়াকে a-থ্যালাসেমিয়া মেজর (α-thalassemia major) বলা হয়।

● যদি α থ্যালাসেমিয়া বহনকারী পিতা ও মাতার একটি শিশু সন্তান জন্মায়; তার মধ্যে সামান্য অথবা ভীষণ রক্তাল্পতা দেখা যেতে পারে অথবা শিশুটি স্বাস্থ্যবানও হতে পারে।

2.6.4 β-থ্যালাসেমিয়া

পিতা এবং মাতার প্রত্যেকের একটি করে জিন নিয়ে মোট দুটি জিন হিমোগ্লোবিনের β-গ্লোবিন অংশ তৈরী করে। যখন এই জিন দুটির একটি অথবা উভয়েই ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখনই β-থ্যালাসেমিয়া হয়। β-থ্যালাসেমিয়া আবার দুই ধরনের হয় ঃ

(1) যদি দুটি জিনের মধ্যে একটি জিন ত্রুটিপূর্ণ হয়, তখন একজন ব্যক্তি এই রোগের বহনকারী হন এবং তার মধ্যে সামান্য রক্তাল্পতা দেখা যায়। এই ধরনের থ্যালাসেমিয়াকে β থ্যালাসেমিয়া মাইনর (β-thalassemia minor) বলা হয়।

(2) যদি দুটি জিনই ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে একজন ব্যক্তি মধ্যবর্তী থেকে, ভীষণ ধরনের রক্তাল্পতার শিকার হন। এই দুই ধরনের অবস্থাকে যথাক্রমে β থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া (β-thalassemia intermedia) এবং β থ্যালাসেমিয়া মেজর (β-thalassemia major) বলা হয়ে থাকে।

● যদি β-থ্যালাসেমিয়া বহনকারী পিতা ও মাতার একটি শিশু সন্তান জন্মায়; নীচের তিনটি ঘটনার যে কোন একটি ঘটতে পারে ঃ

(a) শিশুটি পিতা এবং মাতা দুজনের থেকেই স্বাভাবিক জিনদুটি পেতে পারে এবং শিশুটির রক্ত স্বাভাবিক হয়। এইরূপ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে 25%।

(b) শিশুটি পিতা মাতার একজনের থেকে স্বাভাবিক জিন এবং অন্যজনের থেকে ত্রুটিযক্ত জিন পেতে পারে এবং তার থ্যালাসেমিয়া মাইনর হতে পারে। এর সম্ভাবনা 50%।

(c) শিশুটি পিতা মাতা প্রত্যেকের থেকেই ত্রুটিপূর্ণ জিনদুটি পেতে পারে এবং এদের মধ্যে ভীষণ ধরনের রক্তাল্পতা দেখা যায়। এর সম্ভাবনা 25%।

2.6.5 থ্যালাসেমিয়ার লক্ষণ (Symptoms)

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাধারণত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখতে পাওয়া যায়—

(১) দুর্বল ও ক্লান্ত হওয়া।
(২) গায়ের রং হালকা অথবা হলুদ হয়ে যাওয়া।
(৩) মাথা ব্যাথা হওয়া।
(৪) যকৃৎ এবং প্লীহার আকার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া।

(৫) হৃৎপিণ্ডের আকার বৃদ্ধি পাওয়া।
(৬) লোহিত রক্ত কণিকার আকার হ্রাস পায়।
(৭) রক্তে লোহিত রক্ত কণিকার আকৃতির পরিবর্তন হয়।
(৮) রক্তাল্পতা দেখা দেয়।
(৯) ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে হয়।
(১০) খিদে কমে যায় ইত্যাদি।

2.6.6 চিকিৎসা প্রণালী (Treatment)

নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে থ্যালাসেমিয়া রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

(১) **পরিশ্রুত রক্ত প্রবিষ্ট করা** (Blood transfusion) ঃ

যে সকল রোগীদের ক্ষেত্রে থ্যালাসেমিয়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তাদের নিয়মিত পরিশ্রুত রক্ত প্রদানের মাধ্যমে এই রোগের চিকিৎসা করা হয়। এই পদ্ধতিতে একজন স্বাস্থ্যবান দাতার স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকা সূচের মাধ্যমে রোগীর শিরায় প্রবিষ্ট করানো হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি একটি নিয়মিত সময় অন্তর (সাধারণত 2 – 4 সপ্তাহ অন্তর) করা হয়। কারণ তাতে লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রা রক্তে স্বাভাবিক থাকে। পরিশ্রুত রক্ত গ্রহণ করে রোগী অনেক সুস্থ থাকেন, স্বাভাবিক জীবন যাপন করেন এবং অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারেন।

এই পদ্ধতি যেমন সুবিধাজনক, তেমনি অনেক অসুবিধাও এই পদ্ধতিতে আছে। এই পদ্ধতিতে রোগী যেমন তার জীবন ফিরে পান কিন্তু এটি খুব ব্যয়সাপেক্ষ। এই পদ্ধতি চলাকালীন অনেক ভাইরাস এবং ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ দাতা থেকে রোগীর দেহে প্রবেশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, রোগীর দেহের রক্তে লোহার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যেটি রোগীর যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড এবং শরীরের অন্যান্য অংশের ক্ষতি করে। এই জন্য এই অতিরিক্ত লোহা দেহ থেকে বের করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী।

(২) **দেহের অতিরিক্ত লৌহ অপসারিত করা** (Iron chelation therapy) ঃ

যখন কোনও রোগী নিয়মিত পরিস্রুত রক্ত গ্রহণ করে, তখন তার দেহে অতিরিক্ত লোহা জমা হতে থাকে। শরীরের এই অতিরিক্ত লোহা, আয়রন চিলেশন থেরাপির দ্বারা শরীর থেকে অপসারিত করা হয়ে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে যদি এই অতিবিক্ত লোহা রোগীর দেহ থেকে অপসারণ করা না হয়, তাহলে রোগীর শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির ক্ষতি হয়।

ডিফেরোক্সামিন (deferoxamine) নামক একটি বিশেষ ঔষধ এইজন্য ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধটি রোগীর ত্বকের নীচে সারারাত ধরে একটি ছোট পোর্টেবেল পাম্পের সাহায্যে প্রবেশ করানো হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে কিন্তু এটি খুব বেদনাদায়ক। সেইজন্য অনেক রোগী এই চিকিৎসাপদ্ধতি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। 2005 খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাস থেকে USA-তে ডিফেরাসিরক্স নামক একটি ঔষধ বড়ির মাধ্যমে বাজারে বিক্রির অনুমতি পেয়েছে।

যে সমস্ত রোগীদের দেহে অতিরিক্ত লোহা থাকে, তাদের কোন ভিটামিন বা আয়রন জাতীয় কোনও বস্তু খাওয়া নিষিদ্ধ।

(৩) **শল্যচিকিৎসা** (Surgery) ঃ

যখন রোগীর শরীরের কোনও অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে সেই অঙ্গটি দেহ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে যে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও রোগীর প্লীহা অত্যাধিক বড় হয়ে যায়, তখন সেটি উপরোক্ত পদ্ধতিতে বাদ দেওয়া যায়।

(৪) **অস্থি মজ্জা বা স্টেম কোষ এক দেহ থেকে অপসৃত করে অন্য দেহে সংযোজন** (Bone marrow or stem cell transplants) ঃ

কিছু থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে অস্থি মজ্জা বা স্টেম কোষ দাতার দেহ থেকে অপসৃত করে এদের দেহে সংযোজিত করা হয়েছে। এটি একটি বিপদজনক পদ্ধতি কিন্তু এটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

(৫) **অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিসমূহ** ঃ

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা সহজেই কোনও সংক্রমণের শিকার হয়। তাদের ভিন্ন ধরনের টীকাকরণের সাহায্য নিতে হয়।

রক্তাল্পতার জন্য ফোলিক অ্যাসিড বা ভিটামিন B-এর খুব প্রয়োজন হয়, কারণ এটি লোহিত রক্ত কণিকা গঠনে খুবই উপকারী। তাই রোগীদের নিয়মিত ভিটামিন B সেবন করা দরকার।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা জিন থেরাপি এবং আরও অন্যান্য পদ্ধতিতে থ্যালাসেমিয়া রোগটি সারাবার অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এমন দিন দূরে নেই, যেদিন থ্যালাসেমিয়ার আক্রান্ত কোনও শিশুর জন্মের আগেই তার দেহের স্টেম কোষে স্বাভাবিক জিনটি প্রবেশ করিয়ে শিশুটিকে থ্যালাসেমিয়া থেকে বাঁচানো সম্ভবপর হবে।

2.6.7 সারাংশ

থ্যালাসেমিয়া হল এমন এক ধরনের অস্বাভাবিকতা, যেটি পিতা মাতা থেকে সন্তান সন্ততিতে প্রকাশ পায়। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের প্রধান সমস্যা হল রক্তাল্পতা, যেখানে লোহিত রক্ত কণিকার অক্সিজেন বহনকারী প্রোটিন হিমোগ্লোবিন তৈরীর জিনটি ত্রুটিযুক্ত থাকে।

থ্যালাসেমিয়া সাধারণত দুই ধরনের হয়, α (আলফা) থ্যালাসেমিয়া এবং β (বিটা) থ্যালাসেমিয়া। হিমোগ্লোবিনের α-গ্লোবিন অংশের ত্রুটিজনিত কারণে α থ্যালাসেমিয়া এবং β-গ্লোবিন অংশের ত্রুটিজনিত কারণে β থ্যালাসেমিয়া হয়ে থাকে। এই দুই ধরনের থ্যালাসেমিয়ার আবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণগুলির মধ্যে প্রধান হল রক্তাল্পতা। এছাড়াও রোগীদের মধ্যে দুর্বলতা, মাথা ব্যাথা, গায়ের রং হলুদ হওয়া, যকৃৎ এবং প্লীহার আকারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

নিয়মিত রোগীর দেহে পরিস্রুত রক্ত প্রবিষ্ট করানো, রোগীর দেহ থেকে অতিরিক্ত লৌহ অপসারণ করা প্রভৃতির মাধ্যমে রোগীরা ভয়ঙ্কর এই মারণরোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

2.6.8 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? থ্যালাসেমিয়া সাধারণত কয় প্রকারের হয় ও কি কি তা সংক্ষেপে বৈশিষ্ট্য সহ বর্ণনা করুন।

(২) থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণসমূহ এবং এই রোগের চিকিৎসাপ্রণালী সম্পর্কে যা জান লিখুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) থ্যালাসেমিয়া রোগটি আসলে কি? কি দেখে আমরা বুঝতে পারি যে কোনও রোগী থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত?

(২) α ও β থ্যালাসেমিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৩) থ্যালাসেমিয়া রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রধান দুটি চিকিৎসাপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

একক 2.7 ❑ পরিব্যক্তি বা মিউটেশন (Mutation)

গঠন

2.7.1 ভূমিকা

2.7.1 পরিব্যক্তির কারণ

2.7.1 ক্রোমোজোমাল মিউটেশন

2.7.1 ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন

2.7.1 জিন মিউটেশন

2.7.1 বিষয় সংক্ষেপ

2.7.1 প্রশ্নাবলী

2.7.1 ভূমিকা

পরিব্যক্তি হল কোন প্রাণীর DNA-এর পরিমাণ, বিন্যাস, অথবা গঠনের কোনোও পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের ফলে কোন প্রাণীর জেনোটাইপ তার স্বাভাবিক জেনোটাইপের থেকে পরিবর্তিত হয়ে কোনও অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করতে পারে। একমাত্র জননকোষে যে পরিব্যক্তি হয়, সেটাই বংশানুক্রমে পিতা মাতা থেকে নবজাতকের দেহে প্রবেশ করে।

DNA-এর বিন্যাস বা পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে যে পরিব্যক্তি হয়, তাকে ৰোমোজোমাল পরিব্যক্তি (chromosomal mutation) বা ক্রোমোজোমাল অ্যাব্যারেশন (chromosomal aberration) বলা হয়। অপর পক্ষে DNA-এর একটি নির্দিষ্ট লোকাসে গঠনের পরিবর্তনের ফলে যে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয় তাকে জিন পরিব্যক্তি বা জিন মিউটেশন বলা হয়। সাধারণত পরিব্যক্তি বলতে আমরা জিন পরিব্যক্তিকেই বুঝি।

1901 খ্রিস্টাব্দে ডাচ উদ্ভিদবিদ হিউগো ডি ভ্রিস (Hugo de Vries) প্রথম হঠাৎ হঠাৎ উৎপত্তি হওয়া নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণ উদ্ভাবন করতে গিয়ে পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের কথা বলেন। তার 9 বছর পর টি. এইচ. মরগ্যান (T. H. Morgan) ড্রসোফিলার উপর প্রায় 500 পরিব্যক্তি খুঁজে পেতে সমর্থ হন।

2.7.2 পরিব্যক্তির কারণ

পরিব্যক্তি যখন তখন, যে কোন স্থানে হতে পারে। মিউটেশন স্বাভাবিক কারণেও হতে পারে আবার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেমন আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, X-রশ্মি, গামা (γ) রশ্মি ইত্যাদিও পরিব্যক্তি ঘটাতে সক্ষম। নিউট্রন, কসমিক রেডিয়েশন, α এবং β কণাও পরিব্যক্তির কারণ হতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যেমন ফরম্যালডিহাইড, মাস্টার্ড গ্যাস, ক্যাফিন, কলচিসিন, তামাকের কিছু অংশ, কিছু ঔষধ, খাদ্য সংরক্ষক কিছু জিনিস এবং কীটনাশক পরিব্যক্তির কারণ হতে পারে।

2.7.3 ক্রোমোজোমাল মিউটেশন

ক্রোমোজোমের সংখ্যা বা গঠনের পরিবর্তনের ফলে যে মিউটেশন বা পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়, তাকে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন বলা হয়।

● **ক্রোমোজোমের গঠনের পরিবর্তন ঃ**

ক্রোমোজোমের কোনও অংশের গঠনের পরিবর্তনের ফলে অনেক সময় পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু এতে ক্রোমোজোমের সংখ্যার কোনও পরিবর্তন হয় না। এই ধরনের পরিব্যক্তি চার প্রকারের হতে পারে —

(ক) ডিলিশন (Deletion)

(খ) ডুপ্লিকেশন (Duplication)

(গ) ইনভারশন (Inversion)

(ঘ) ট্রান্সলোকেশন (Translocation)

ডিলিশন এবং ডুপ্লিকেশন-এ একটি ক্রোমোজোমে DNA-এর পরিমাপের পরিবর্তন ঘটে। ইনভারশনে ক্রোমোজোমের বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে এবং ট্রান্সলোকেশনে ক্রোমোজোমের অংশের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে।

(ক) **ডিলিশন ঃ** ডিলিশন হল এমন একটি ক্রোমোজোমাল পরিব্যক্তি, যেখানে ক্রোমোজোমের একটি অংশ লুপ্ত (loss) হয়ে যায়। সেই অবলুপ্ত অংশটি ক্রোমোজোমটির অন্য কোনও অংশে গিয়ে পুনরায় যুক্ত হতেও পারে।

পরিব্যক্তি ঘটায় এমন কোনও বস্তু যেমন ডিলিশন ঘটাতে পারে, তেমনি রিকম্বিনেশনে ভুলের কারণেও ত্রুটি হতে পারে।

ডিলিশনে যেহেতু ক্রোমোজোমের একটি অংশ লুপ্ত হয়ে যায়, সেহেতু এই প্রকারের পরিব্যক্তি আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না।

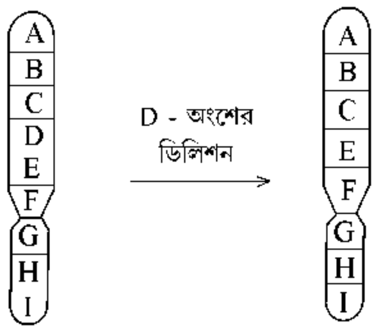

চিত্র 7.1 ঃ ক্রোমোজোমের একটি খণ্ডের ডিলিশন (এখানে D)

ডিলিশনের প্রকার কেমন হবে, সেটা নির্ভর করে সেই জিনগুলির উপর, যারা ডিলিশনের ফলে লুপ্ত হয়ে যায়। ডিপ্লয়েড প্রাণীদের উপর ডিলিশনের প্রভাব সেইরকম প্রকট হয় না, কারণ একটি ক্রোমোজোমের অবলুপ্ত জীনগুলির সেট তার হোমোলোগাস (homologous) ক্রোমোজোমে বর্তমান থাকে। কিন্তু হোমোলোগাস ক্রোমোজোমটি যদি কোন বাজে রোগের প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive) বিশিষ্ট কোনও জীন বহন করে, তাহলে তার ফল মারাত্মক হয়। ডিলিশনের ফলে যদি কোনও ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ার লুপ্ত হয়ে যায়, তবে সেটি অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে (Acentric chromosome) পরিণত হয় এবং মিয়োসিসের মাধ্যমে লুপ্ত হয়ে যায়। এর ফলে পুরো জিনোম থেকে ক্রোমোজোমটির অবলুপ্তি ঘটে।

ক্রোমোজোমের বিভিন্ন অংশের অবলুপ্তির ফলে মানুষের মধ্যে অনেক প্রকার অস্বাভাবিকতা দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ একটি অস্বাভাবিকতা যা হেটারোজাইগাস ডিলিশনের ফলে হয়ে থাকে, তা হল **ৰাই-ডিউ চ্যাট সিনড্রোম** (Cri - du - chat syndrome)। ক্রোমোজোম 5-এর ছোট বাহুর কিছু অংশের ডিলিশনের ফলেই এটি হয়। যে সব শিশুদের এই অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তারা মানসিক ভাবে অপরিণত হয়। তাদের শারীরিক কিছু দুর্বলতা থাকে এবং তারা যখন কাঁদে সেটা বিড়ালের 'মিউ' ডাকের মত শোনায়।

আর একটি হেটারোজাইগাস ডিলিশন, যেটি ক্রোমোজোম - 15-এর দীর্ঘ বাহুর একটি অংশের ডিলিশনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর ফলে যে অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি হয়, তা হল **প্রেডার-উইলি সিন্ড্রোম** (Prader - Willi - Syndrome)। যে সব শিশুর মধ্যে এই অস্বাভাবিকতা দেখা যায়, তাদের দুগ্ধপানে অসুবিধা হয়, মানসিক পরিণতি আসতে দেরি হয় এবং তাদের ব্যবহার সাধারণ শিশুদের মত হয় না।

(খ) ডুপ্লিকেশন ঃ ডুপ্লিকেশন হল এমন একটি ক্রোমোজোম পরিব্যক্তি, যেখানে ক্রোমোজোমের একটি অংশ দ্বিগুণ হয়ে যায়। ডুপ্লিকেশন একটি প্রাণীর কাছে ক্ষতিকর হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। অসমান ক্রসিং ওভার (unequal crossing over) অনেকক্ষেত্রে ডুপ্লিকেশনের জন্য দায়ী।

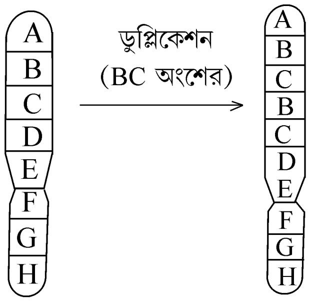

চিত্র 7.2 ঃ ক্রোমোজোমের একটি অংশের ডুপ্লিকেশন (এখানে BC)

ক্রোমোজোমের একটি অংশের ডুপ্লিকেশন পরপরও হতে পারে (tandem) আবার ভিন্ন স্থানেও হতে পারে। যখন দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া অংশে জিনের বিন্যাস আসল বিন্যাসের বিপরীতে হয়, তাকে বিপরীত ডুপ্লিকেশন বলে (reverse duplication)। যখন দ্বিগুণ হয়ে যাওয়া ৰোমোজোমের অংশ একটি ক্রোমোজোমের প্রান্তে পরপর থাকে, তাকে টার্মিনাল ডুপ্লিকেশন (terminal duplication) বলে।

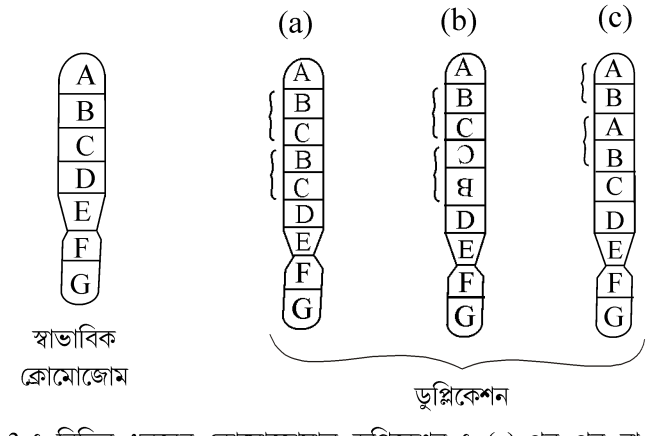

চিত্র 7.3 ঃ বিভিন্ন ধরনের ক্রোমোজোমাল ডুপ্লিকেশন ঃ (a) পর পর বা tandem
(b) বিপরীত বা reverse (c) প্রান্তিক বা terminal

(গ) ইনভারশন (Inversion) ঃ

ইনভারশন হল এমন একটি ক্রোমোজোমাল মিউটেশন যেখানে ক্রোমোজোমের একটি অংশ প্রথমে ক্রোমোজোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পরে 180^0 আবর্তন করে পুনরায় ঐ ক্রোমোজোমে যুক্ত হয়। যে অংশটি পুনরায় যুক্ত হয় সেটি যদি সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত হয়, তাহলে তাকে পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন (pericentric inversion) বলে। যদি সেই পুনরায় যুক্ত হওয়া অংশটি ক্রোমোজোমের বাহুর একটি প্রান্তে যুক্ত হয় এবং যদি সেটি সেন্ট্রোমিয়ার মুক্ত হয়, তখন তাকে বলে পেরাসেন্ট্রিক ইনভারশন (peracentric inversion)।

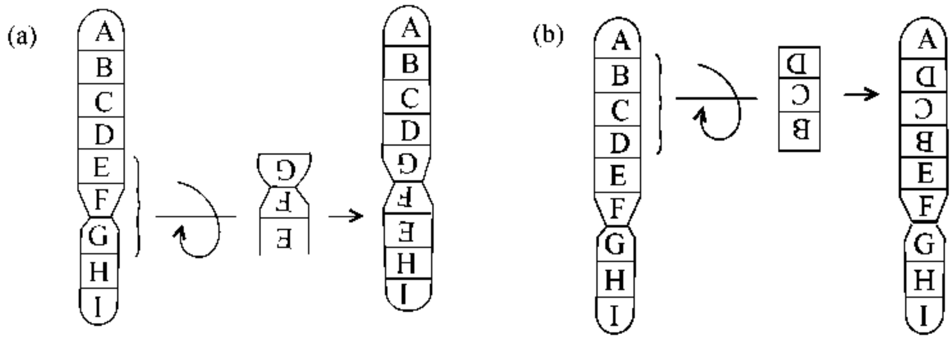

চিত্র 7.4 ঃ ইনভারশন (a) পেরিসেন্ট্রিক ইনভারশন (সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত) (b) পেরাসেন্ট্রিক ইনভারশন (সেন্ট্রোমিয়ার মুক্ত)

(ঘ) ট্রান্সলোকেশন (Translocation) ঃ

ট্রান্সলোকেশন হল এমন একটি ক্রোমোজোমাল মিউটেশন যেখানে ক্রোমোজোমের একটি খণ্ডের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়। ট্রান্সলোকেশন সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমটিতে একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমেই সেই ক্রোমোজোমটির খণ্ড বিশেষের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়। একে বলা হয় ইনট্রাক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন (intrachromosomal translocation)। অপরটিতে একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের খণ্ড বিশেষ ঐ ক্রোমোজোম থেকে অন্য একটি ননহোমোলোগাস ক্রোমোজোমে স্থানান্তরিত হয়। একে ইনটারক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

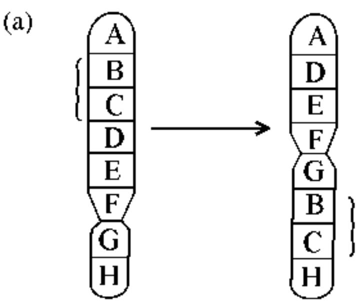

চিত্র 7.5 ঃ ননরেসিপ্রোকাল ইনট্রাক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

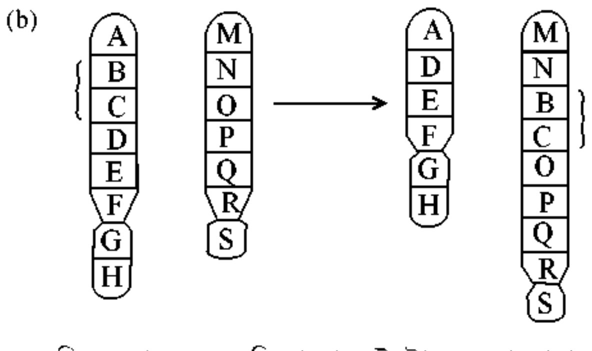

চিত্র 7.6 ঃ ননরেসিপ্রোকাল ইনটারক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

(c)

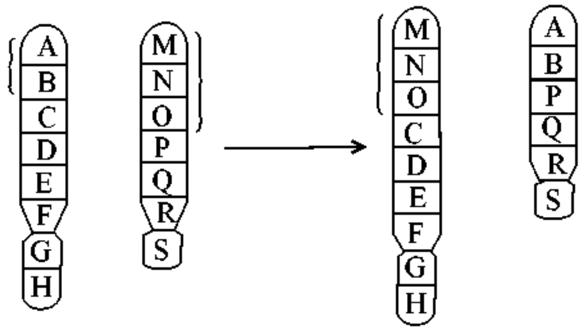

রেসিপ্রোকাল ইন্টারক্রোমোজোমাল ট্রান্সলোকেশন

চিত্র 7.7 ঃ ট্রান্সলোকেশন ঃ (a) ননরেসিপ্রোকাল ইনট্রাক্রোমোজোমাল, (b) ননরেসিপ্রোকাল ইন্টারক্রোমোজোমাল, (c) রেসিপ্রোকাল ইন্টারক্রোমোজোমাল।

(interchromosomal translocation) বলা হয়। যদি এই স্থানান্তর একটি ক্রোমোজোম থেকে অন্য একটি ক্রোমোজোমে হয়, তখন তাকে নন রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন (nonreciprocal translocation) বলে। অপরপক্ষে যদি একটি ৰোমোজোমের খণ্ডবিশেষ অপর একটি ৰোমোজোমে এবং অপর ক্রোমোজোমটির খণ্ডবিশেষ প্রথম ক্রোমোজোমটিতে স্থানান্তরিত হয়, তখন তাকে রেসিপ্রোকাল ট্রান্সলোকেশন (reciprocal translocation) বলা হয়।

2.7.4 ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তন

ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার থেকে বেড়ে বা কমে গেলেও অনেক সময় পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। মিয়োসিস I অথবা II -তে নন-ডিসজাংশনের ফলে অপত্য কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে বা কমে যায়। এই ধরনের পরিব্যক্তি ভিন্ন ধরনের হতে পারে।

(ক) **অ্যানিউপ্লয়ডি** (Aneuploidy)

অ্যানিউপ্লয়ডিতে এক বা একাধিক ক্রোমোজোম নর্মাল বা স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সেটের সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা হ্রাস পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যানিউপ্লয়ডি প্রাণীদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হয়।

ডিপ্লয়েড প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা ৪ প্রকারের অ্যানিউপ্লয়ডি দেখতে পাই।

(১) **নালিসোমি** (Nullisomy) ঃ

এইক্ষেত্রে এক জোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোজোম স্বাভাবিক সেটের থেকে হ্রাস পায় এবং কোষটি 2N – 2-তে পরিণত হয়। মিয়োসিসে ননডিসজাংশনের ফলেই এইরূপ হয়।

(২) **মেনোসোমি** (Monosomy) ঃ

মোনোসোমিক কোষে স্বাভাবিক ক্রোমোজোম সেট থেকে একটি ক্রোমোজোম কমে যায় এবং কোষটি 2N–1-এ পরিণত হয়।

(৩) **ট্রাইসোমি** (Trisomy) ঃ

ট্রাইসোমিক কোষে একটি ক্রোমোজোম বেশী থাকে। তার মানে হল এই কোষগুলিতে একটি ক্রোমোজোমের

তিনটি অনুকৃতি (copy) থাকে এবং অন্য ক্রোমোজোমগুলির দুটি করে অনুকৃতি থাকে। একটি ট্রাইজোমিক কোষ হল 2N + 1।

(৪) **টেট্রাসোমি** (tetrasomy) ঃ

টেট্রাসোমিক কোষে এক জোড়া ক্রোমোজোম বেশী থাকে। তার মানে একটি ক্রোমোজোমের ৪টি অনুকৃতি থাকে এবং অন্য ক্রোমোজোমগুলির দুটি করে অনুকৃতি থাকে। একটি টেট্রাসোমিক কোষ হল 2N + 2।

● **ট্রাইসোমি** 21 (Trisomy 21) ঃ

এই রকম ঘটনা তখনই ঘটে যখন কোনও কোষে 21 নম্বর ক্রোমোজোমটির তিনটি অনুকৃতি থাকে। প্রায় 1 লক্ষ মানুষের মধ্যে 1430 জন এই অস্বাভাবিকতার শিকার। এই নির্দিষ্ট প্রকারের অস্বাভাবিকতাকে বলা হয় ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome)।

যে শিশুরা এই অস্বাভাবিকতায় ভোগে তাদের বুদ্ধি কম হয়, হাত ছোট হয়, উচ্চতা কম হয়, চোখের নীচের চামড়া ফুলে যায় ইত্যাদি।

মায়েদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই রোগের প্রবণতা আরও বাড়তে থাকে। দেখা গেছে যে 45 থেকে 47 বছরের বয়সী মায়েদের শিশুদের এই প্রকার রোগ হবার প্রবণতা সবথেকে বেশি হয়। (10000 এ 333 জন)।

(খ) **মোনোপ্লয়ডি** (Monopolidy) ঃ

কোনোও মোনোপ্লয়েড প্রাণীতে, সাধারণত দুটি ক্রোমোজোম সেটের স্থানে একটি মাত্র ক্রোমোজোম সেট থাকে। মোনোপ্লয়ডিকে অনেক সময় হ্যাপ্লয়ডিও বলা হয়। মোনোপ্লয়ডি সচারচর দেখা যায় না। কিছু কিছু প্রজাতিতে আমরা মোনোপ্লয়েড প্রাণীদের দেখতে পাই। উদাহরণ হিসেবে পুরুষ বোলতা, পিপীলিকা এবং মৌমাছিদের কথা বলা যেতে পারে।

(গ) **পলিপ্লয়ডি** (Polyploidy) ঃ

পলিপ্লয়েড প্রাণীদের ক্রোমোজোম সেটের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে বেশী হয়। উদ্ভিদ জগতেই আমরা বেশীর ভাগ পলিপ্লয়ডি দেখতে পাই। একমাত্র উত্তর অ্যামেরিকার মিষ্টি জলের এক প্রকারের সাকার মাছেদের মধ্যে এবং কিছু স্যালামান্ডারের (Salamander) মধ্যে আমরা পলিপ্লয়ডি দেখতে পাই। এছাড়া কোনও জীবন্ত প্রাণীতে আমরা পলিপ্লয়ডি দেখতে পাই না।

পলিপ্লয়ডি আবার দুই ধরনের হয়। অটোপলিপ্লয়ডি (Autopolyploidy) এবং অ্যালোপলিপ্লয়ডি (Allopolyploidy)। এই দুটি প্রকারই আমরা উদ্ভিদ জগতে দেখতে পাই।

● **অটোপলিপ্লয়ডি ঃ**

অটোপলিপ্লয়ডিতে সমস্ত ক্রোমোজোম সেটগুলি একই প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়। মিয়োসিসে কিছু ত্রুটির জন্যই এটা হয় এবং এর ফলে ডিপ্লয়েড (2N) অথবা ট্রিপ্লয়েড (3N) জনন কোষের সৃষ্টি হয়। যখন একটি ডিপ্লয়েড জনন কোষ (2N) একটি স্বাভাবিক জনন কোষের (N) সঙ্গে মিলিত হয়। তাহলে এর থেকে যে অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়, তাতে তিনটি ৰেক্রামোজোম সেট থাকে (3N)। বাজারে যে চাষ করা কলা পাওয়া যায়, সেটি টিপ্লয়েড অটোপলিপ্লয়েডের একটি উদাহরণ।

● **অ্যালোপলিপ্লয়ডি** (Allopolyploidy) ঃ

অ্যালোপলিপ্লয়ডিতে ক্রোমোজোমের সেটগুলি ভিন্ন ধরনের প্রজাতি থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু প্রজাতিগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়। এই ঘটনার সৃষ্টি হয় নিম্নরূপ ভাবে ঃ

প্রথমে দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সংকরায়ণ (hybridisation) ঘটানো হয় এবং এর থেকে যে অপত্য কোষটির সৃষ্টি হয় (2N) তাতে পিতা এবং মাতার প্রত্যেকের হ্যাপ্লয়েড (N) ক্রোমোজোম সেট থাকে। এর পরে অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সেটটিকে দ্বিগুণ করে দিয়ে আমরা (4N) অ্যালোপলিপ্লয়েড পেতে পারি।

সংকরায়ণের মাধ্যমে যে সব উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে বন্ধ্যাত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

1928 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী কারপেচেনকো (Karpechenko) প্রথম, বাঁধাকপি (*Brassica oleracea*) এবং মূলোর (*Raphanus sativus*) মধ্যে সংকরায়ণ ঘটিয়ে অ্যালোপলিপ্লয়েড তৈরী করেন। এদের দেখতে বাঁধাকপি এবং মূলার মধ্যবর্তি হয়েছিল এবং এদের নাম দেওয়া হয়েছিল *Raphanobrassica* (দুটি জেনাসের মধ্যবর্তী নাম)।

কৃষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যালোপলিপ্লয়েড হল গম (*Triticum aestivum*), যা সংকরায়ণের মাধ্যমে চাষ করা হয়।

2.7.5 জিন মিউটেশন

কোনও জিনের অনুক্রমের (gene sequence) পরিবর্তনের ফলে যে পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়, তাকে জিন পরিব্যক্তি বলে। একটি মাত্র বেস পেয়ারে (base pair) DNA ক্রমের যে পরিবর্তন হয়, তাকে পয়েন্ট মিউটেশন (point mutation) বলা হয়। জিন মিউটেশন আবার নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে ঃ

(১) **বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন মিউটেশন** (base pair substitution mutation) ঃ

একেই পয়েন্ট মিউটেশন বলা হয়। এটি একটি জিনের পরিবর্তন, যেখানে একটি বেস পেয়ার অন্য একটি বেস পেয়ারের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

উদা ঃ AT থেকে GC হওয়া।

(২) **ট্রান্জিসন মিউটেশন** (Transition mutation) ঃ

এটি একটি নির্দিষ্ট প্রকারের বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন মিউটেশন যেখানে একটি পিউরিন-পিরিমিডিন বেস পেয়ার অন্য একটি পিউরিন - পিরিমিডিন বেস পেয়ারে পরিবর্তিত হয়।

উদা ঃ AT থেকে GC, GC থেকে AT, TA থেকে CG, এবং CG থেকে TA।

(৩) **ট্রান্সভারসন মিউটেশন** (transversion mutation) ঃ

এটি হল অন্য এক প্রকারের বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন মিউটেশন যেখানে একটি পিউরিন-পিরিমিডিন বেস পেয়ার অপর একটি পিরিমিডিন-পিউরিন বেস পেয়ারে পরিবর্তিত হয়।

উদা ঃ AT থেকে TA, GC থেকে CG, AT থেকে CG এবং GC থেকে TA।

আমরা জানি যে অ্যামাইনো অ্যাসিড (amino acid) ক্রমানুসারে সজ্জিত হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরী করে। সুতরাং প্রোটিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিবর্তনের ফলেও অনেক সময় পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। নিম্নলিখিত পরিব্যক্তিগুলি হল এই প্রকারের ঃ

(৪) **মিসসেনস পরিব্যক্তি** (missense mutation) ঃ

এটি হল এক ধরনের জিন মিউটেশন যেখানে DNAএর একটি বেস পেয়ার পরিবর্তনের ফলে mRNA কোড (Codon)-এর পরিবর্তন ঘটে এবং এর ফলে প্রোটিনের পলিপেপটাইডে স্বাভাবিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থানে একটি ভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয় এবং এর ফলে একটি ভিন্ন ফেনোটাইপ সৃষ্টি হয়।

উদা ঃ একটি AT থেকে GC পরিবর্তন, DNA-এর নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

$$\begin{matrix} 5' - AAA - 3' \\ 3' - TTT - 5' \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 5'\ GAA - 3' \\ 3'\ CTT - 5' \end{matrix}$$

এই পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডনের নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটে।

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - GAA - 3'$$

এর ফলে অ্যামাইনো অ্যাসিড লাইসিন (lysine) অ্যামাইনো অ্যাসিড গ্লুটামিন-এ পরিবর্তিত হয় (glutamine)।

(৫) **নিউট্রাল পরিব্যক্তি** (Neutral mutation) ঃ

এটি হল এমন এক ধরনের জিন মিউটেশন যেখানে DNA -এর একটি বেস পেয়ারের পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডন এর পরিবর্তন ঘটে কিন্তু এর ফলে যে ভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিড, স্বাভাবিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থান দখল করে সেটি সেই একই প্রোটিন তৈরী করে।

উদা ঃ AT থেকে GC পরিবর্তন, কোডনে নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - AGA - 3'$$

এর ফলে লাইসিনের (lysine)-এর স্থানে আর্জিনিন (arginine) তৈরী হয়। কিন্তু যেহেতু এই দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডের ধর্মগুলি প্রায় একই রকমের হয়, এর ফলে প্রোটিনের ধর্মের কোন পরিবর্তন হয় না।

(৬) **ননসেনস পরিব্যক্তি** (Nonsense mutation) ঃ

ননসেনস পরিব্যক্তিতে DNA-এর বেস পেয়ারে এমন একটি পরিবর্তন ঘটে যার ফলে mRNA কোডন দ্বারা একটি নির্দিষ্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থানে UAC, UAA অথবা UGA এই অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির কোনও একটি তৈরী হয়। আমরা জানি যে, এই তিনটি অ্যামাইনো অ্যাসিড RNA থেকে প্রোটিন তৈরী হওয়া বন্ধ করে দেয়।

উদা ঃ AT থেকে TA পরিবর্তন DNA-এর নিম্নরূপ পরিবর্তন ঘটায়।

$$\begin{matrix} 5' - AAA - 3' \\ 3' - TTT - 5' \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 5'\ TAA - 3' \\ 3'\ ATT - 5 \end{matrix}$$

এর ফলে mRNA কোডন-এর নিম্নরূপ পরিবর্তন হয়।

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - UAA - 3'$$

(৭) **সাইলেন্ট পরিব্যক্তি** (Silent mutation) ঃ

সাইলেন্ট পরিব্যক্তিতে জিনের বেস পেয়ারে পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডনের যে পরিবর্তন হয় তার ফলে একই অ্যামাইনো অ্যাসিড পূর্বের অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্থানে তৈরী হয়। এর ফলে প্রোটিনের স্বাভাবিক ধর্মের কোনও পরিবর্তন হয় না।

উদা ঃ AT থেকে GC পরিবর্তনের ফলে mRNA কোডন নিম্নরূপে পরিবর্তিত হয়

$$5' - AAA - 3' \rightarrow 5' - AAG - 3'$$

এই দুটি অ্যামাইনো অ্যাসিডই লাইসিন (lysine) তৈরী করে।

(৮) **ফ্রেমশিফ্‌ট পরিব্যক্তি** (Frameshift mutation) ঃ

ফ্রেমশিফ্‌ট পরিব্যক্তি হল এমন একটি মিউটেশন যেখানে এক বা একাধিক বেস পেয়ার জিনে যুক্ত হয় অথবা জিন থেকে মুক্ত হয়। এর ফলে mRNA কোডন-এর পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে যে প্রোটিন তৈরী হয় তা ধর্মের দিক থেকে পরিবর্তিত হয়।

2.7.6 সারাংশ

কোনও প্রাণীর DNA-এর পরিমাণ, বিন্যাস অথবা গঠনের কোনও পরিবর্তনকেই পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলা হয়। পরিব্যক্তি স্বাভাবিক কারণেও হতে পারে আবার কৃত্রিম উপায়েও সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সমূহ, কিছু ঔষধ, কীটনাশক ও খাদ্যসংরক্ষক কিছু বস্তু, পরিব্যক্তির কারণ হতে পারে।

ক্রোমোজোমের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে এবং গঠনের পরিবর্তনের ফলে ক্রোমোজোমাল পরিব্যক্তি সৃষ্টি হয়। ক্রোমোজোমের কোনও অংশের গঠনের পরিবর্তনের ফলে সাধারণত 4 ধরনের মিউটেশনের সৃষ্টি হয়। এগুলি হল - ডিলিশন, ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন এবং ট্রান্সলোকেশন। আবার ক্রোমোজোমের সংখ্যা স্বাভাবিকের থেকে বেড়ে বা কমে গেলেও পরিব্যক্তির সৃষ্টি হয়। এগুলি হল অ্যানিউপ্লয়ডি, মনোপ্লয়ডি এবং পলিপ্লয়ডি।

ক্রোমোজোমাল পরিব্যক্তির মত আমরা জিন পরিব্যক্তিও দেখতে পাই যা কোনও জিনের অনুক্রমের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হয়ে থাকে। জিন মিউটেশন আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন বেস পেয়ার সাবসটিটিউশন, ট্রানজিশন, ট্রান্সভারসন, নিউট্রাল, মিসসেনস, ফ্রেমশিফট, সাইলেন্ট এবং ননসেনস পরিব্যক্তি।

2.7.7 প্রশ্নাবলী

দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) পরিব্যক্তি বা মিউটেশন বলতে কি বোঝো? এটি কি কি কারণে হতে পার? সংক্ষেপে ক্রোমোজোমাল মিউটেশন বর্ণনা করুন।

(২) পরিব্যক্তি কয় প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

(৩) জিন মিউটেশন কি? সংক্ষেপে বিভিন্ন ধরনের জিন মিউটেশনগুলির বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(১) পরিব্যক্তি বা মিউটেশনের কারণগুলি কি?

(২) স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম পরিব্যক্তি বলতে কি বোঝেন?

(৩) ডিলিশন এবং ডুপ্লিকেশন বলতে কি বোঝেন?

(৪) ইনভারশন এবং ট্রান্সলোকেশন পরিব্যক্তি কিভাবে ঘটে থাকে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(৫) ক্রাই-ডিউ-চ্যাট এবং প্রেডার উইলি সিনড্রোম বলতে কি বোঝেন?

(৬) ট্রাইজোমি - 21 বলতে কি বোঝ? এর লক্ষণগুলি কি কি?

(৭) অটোপলিপ্লয়ডি এবং অ্যালোপলিপ্লয়ডি বলতে কি বোঝ? এদের মধ্যে প্রধান তফাৎ কি?

(৮) মিসসেনস, ননসেনস এবং সাইলেন্ট মিউটেশন বলতে কি বোঝেন?

(৯) নিউট্রাল মিউটেশন কি? এর সঙ্গে ফ্রেমশিফ্ট মিউটেশনের পার্থক্য কোথায়?

(১০) ট্রান্সজিশন এবং ট্রান্সভারসন মিউটেশনের মধ্যে পার্থক্যটি উল্লেখ কর। একটি উদাহরণ দিন।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 225.00

Published by : Netaji Subhas Open University, 1, Woodburn Park, Kolkata - 700 020 & Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006